আলাদা আলাদা অর্থ ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করে। তাই আল্লাহ্ তাআলা এখানে বলছেন, তিনিই খোদা, যিনি নিজ সত্তায় ও নিজ গুণাবলীতে চরম ও পরমভাবে পরিপূর্ণ, সেই তিনি, এই রসূলকে পথ নির্দেশনা (হেদায়াত) ও সত্য ধর্ম (দ্বীনে হাক্ক) সহকারে আবির্ভূত করেছেন, আর তার আগমণ করা ও প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য **লিইউয হিরাহু আলাদ্ দীনে কুল্লিহী** অর্থাৎ সব ধর্মসমূহের উপর এই শরীয়তের (বিধি-বিধানের) এবং এই রসূলের প্রাধান্যকে তিনি সাব্যস্ত করেছেন। সত্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে আপনা থেকেই সেই ধর্ম আনয়নকারীর শ্রেষ্ঠত্বও সাব্যস্ত হয়ে যায়। এখানে **লি ইউয হিরাহু আলাদ্ দীনে কুল্লিহি** বলা হয়েছে যার অর্থ হলো, ওই সব ধর্ম যেগুলো আঁ হযরত (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো যখনই ইসলামের মুকাবিলায় আসবে পর্যূদস্ত ও পরাভূত হবে। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপায় উপকরণ রেখেছেন আর তাতে এটাও নির্দেশ করা হয়েছে যে ইসলামের শরীয়ত (বিধি বিধান) অবতরণের পর যদি কোন মিথ্যা ধর্ম-বিধান গজিয়ে ওঠে তবে তারও উপর এটা (সত্য ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম) বিজয়ী হবে। কেননা এখানে ধর্মের সাথে 'বিগত কালের ধর্ম' এর শর্ত আরোপিত হয় নাই। যেমন রয়েছে 'বাহাই', তারা কুরআন করীমের বিপরীতে নিজেদের জন্য নতুন ধর্ম বানিয়েছে। কুরআন করীমের দাবী– এমন সব ধর্ম যে সব ইসলামের শরীয়তের পর দেখা দেবে তাদের নির্মূল করার শক্তিও কুরআনের রয়েছে।

কেননা এটা ওই খোদারই কথা যিনি হলেন **আল্লামুল গুয়্যুব** (অদৃশ্য ভবিতব্যের জ্ঞান রাখেন), যার জ্ঞানে ওই সব বিষয়ও আছে যা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হওয়ার রয়েছে। অতএব দ্বীন ইসলামই একমাত্র সেই ধর্ম যার মোকাবিলায় ভবিষ্যতের কিংবা অতীত কালের কোন ধর্মই তিষ্ঠিতে পারে না। ওইটা (অর্থাৎ ইসলাম) প্রতিটিরই উপর নিজস্ব তত্ত্ব-দর্শনপূর্ণ যৌক্তিক দলীলের দ্বারা ও নিজ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ সত্যতা ও পথনির্দেশনার মাধ্যমে, ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিজয় লাভ করার শক্তি ও সামর্থ্য রাখে।

অতএব **হুদাল্লিল আ'লামীন** সমগ্র জগতের জন্য হেদায়াতের দাবী কেবল কুরআন করীমই করেছে আর কার্যতঃ তা প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছেও।

আমি উল্লেখ করেছি যে, অভিধানে **হেদায়াত**-এর চারটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অর্থ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে যে খুতবা ছেপে গিয়েছে তাতে সামান্য কিছু তাৎপর্যগত বিশ্লেষণ উল্লেখিত হয়েছে। তা সবিস্তারে এখন উল্লেখ করছি– **হেদায়াত**-এর প্রথম অর্থটি হচ্ছে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ও আত্মোপলব্ধির

জন্য যে নির্দেশনা আবশ্যক তাকে হেদায়াত বলে। তবে বুদ্ধি-বিবেচনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা আহরিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞান এবং তা অর্জন করার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ী যে ভান্ডার গড়ে ওঠে তা যথেষ্ট নয় বরং তার জন্যও আকাশ থেকে বিশেষ কোন হেদায়াতের আবশ্যকতা থেকেই যায়।

তাই এমন হেদায়াতই (পথ নির্দেশনা) সমগ্র মানবকুলের মাঝে সার্বজনীনতা রাখে, শুধুই একটি ধর্মগোষ্ঠীর মাঝে এটা কুক্ষিগত হয়ে থাকার জন্য নয়। এমন সার্বজনীন পথনির্দেশনাও, কুরআন বলে, 'সার্বজনীন পথ-নির্দেশনা আমিই'। এমন জ্ঞান-বুদ্ধি নিজেই তো অন্ধ যদি তার সাথে ঐশী বাণীর জ্যোতি না থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এটা জানানোর জন্য যে, দৈহিক যোগ্যতা ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্য যথেষ্ট হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আকাশ থেকে তার হেদায়াতের উপকরণাদির উদ্ভব ঘটানো না হয়। এ সম্পর্কিত বহু উদাহরণ কুরআন করীমে দেয়া হয়েছে। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে, মৌমাছিকে আমরা ইলহাম করে থাকি। কুরআন করীমের কেবল এই একটি দাবীই নয় বরং ঐশী হস্তক্ষেপের অধীনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানবীয় অভিজ্ঞতা অতীব উজ্জ্বলতম রূপে পবিত্র কুরআন করীমের এই দাবীকে সত্য সাব্যস্ত করে চলছে। যেমন মৌমাছি সম্পর্কে গবেষণায় যেসব নতুন তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে তাতে একটি বিষয় যা জ্ঞাত হওয়া গিয়েছে তা হলো 'মৌমাছির পাল'-এর রাণী মৌমাছিটি ডিম দেয়। ডিম পাড়বার কালে তার এই ইলহাম হয় যে ওই ডিমে 'পুরুষ কীট' হবে, না 'মাদী কীট' হবে। মৌচাকে বিভিন্ন অংশ নির্ধারিত আছে। এক অংশের প্রকোষ্ঠগুলোতে মা-মৌমাছি ঐ ডিমগুলো রাখে যা থেকে পুরুষ মৌমাছি জন্মাবে আর মৌচাকের অন্য এক অংশে ওই ডিমগুলো জমা করে যা থেকে 'মাদী মৌমাছির কীট' জন্মাবে। এভাবে একটি মৌমাছি যাকে রাণী মৌমাছি বলা হয় হাজার হাজার ডিম দিয়ে থাকে। আর প্রতিবার যখনই সে ডিম দেয় তখনই তাকে জানানো হয় যে, ওথেকে পুরুষ মৌমাছি জন্মাবে না স্ত্রী মৌমাছি।

এভাবে অনুরূপ বহু উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বুঝিয়েছেন যে কেবল নিজ শক্তি সামর্থ্য ও নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপর নির্ভর করো না। যতক্ষণ আকাশ থেকে তোমাদের জন্য হেদায়াতের (পথ-নির্দেশনার) অবতরণ না হয়, তোমরা কোন ক্ষেত্রেই কখনও প্রকৃত সফলতা লাভ করতে পারবে না। যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা সব মানুষকেই

আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন আর যারা খোদা তা'লা প্রদত্ত ওই নিয়ম-নীতির উপর চলে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অন্তঃনিক্ষিপ্ত নির্দেশ ও বার্তা তারা লাভ করে আর এভাবে নব-নব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে উদিত হয়, হোক সে কোন মুসলমান বা খ্রীষ্টান বা নাস্তিক অথবা অন্য কোন ধর্মে বিশ্বাসী, এমন কী তার সম্পর্ক কোন কুবিশ্বাসের সাথে বা 'লা মাযহাবী'র সাথেই থাকুক না কেন, কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না। কেননা খোদা তা'লা বুদ্ধি-বিবেচনাকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট দিয়ে মানুষের জন্য সার্বজনীন করে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন এটা বলে যে, অন্যান্য কিছু হেদায়াতমূলক নির্দেশনা থেকে এটি ভিন্নতর, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তা হলো, আমরা বুদ্ধি-বিবেচনাকেও পথ দেখিয়ে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টিকে অতুলনীয় সুন্দর সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করেছেন যে ওহী ইলহামের মাধ্যমে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে আল্লাহ্ তা'লা সতেজ ও তীক্ষ্ণতর করেন যার ফলে স্মৃতিশক্তি ও মেধা বিকশিত হয়ে জ্ঞানের পরিপোষণ হয়ে থাকে, কুরআন করীম ওথেকে সেবক হিসেবে সেবা গ্রহণ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

> খোদা তা'লার সত্ত্বা ও সৃষ্টিশীলতা আর তার তৌহীদ (একত্ব), মহিমা ও কৃপা, স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা, দানশীলতা ইত্যাদি ঐশ্বরিক গুণাবলী শনাক্ত করার জন্য যতটা দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে, যুক্তি প্রমাণকে প্রয়োগ করা হয়েছে পরিপূর্ণভাবে প্রায়োগিক উৎকর্ষের বিশেষত্বে... সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মতভাবে সূক্ষ্ম ও সঠিক পরিমাপে বর্ণনা করা হয়েছে... এবং ... উল্লেখিত জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ও জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা এমন এক শিষ্টতাপূর্ণ সাময়িক সেবা নিয়েছে যেমনটা কখনও কোন মানুষ থেকে নেয়নি (সূরমা চশমায়ে আরিয়া, পৃষ্ঠা ২৪-২৫, টীকা)।

আর এটা কুরআন করীমের চরম উৎকর্ষ যে, যুগের চাহিদা মাফিক জ্ঞানের মুখোমুখি হলে অন্য ধর্মগুলো তো চাপা পড়ে যেতে পারে কিন্তু ইসলাম এমনই এক ধর্ম আর কুরআন করীম এমন এক কিতাব যা কোন জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের সামনে অবনত হয় না। বরং সেসবকে সেবক মনে করে আর ওদেরই থেকে সেবা গ্রহণ করে ।

হেদায়াত-এর দ্বিতীয় অর্থ হলো শরীয়ত অর্থে যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধান। তাই **হুদাল্লিল আ'লামীন**-এর অর্থ হবে ওই শরীয়ত যা

আ'লামীন-এর জন্য–সমগ্র জগতের ও সকল যুগের জন্যও আর কেবল কুরআন করীমই **হুদাল্লিল আ'লামীন**। এ কারণেই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়াকে সম্বোধন করে বলেন,

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

ইন্নি রাসূলুল্লাহে ইলাইকুম জামিআঁন (সূরা আল্ আ'রাফ আয়াত নং ১৫৯)

কুরআন করীমে এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেটি সমগ্র জগতের ও সকল যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছে, এ দাবী কেবল কথার কথা নয় বরং অনস্বীকার্য এক বাস্তব সত্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথায় তা স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শুনুন।

হুযূর (আ.) বলেন,

> যেভাবে ধর্মীয় জ্ঞানের উচ্চমার্গের তত্ত্বকথা ও তার পবিত্র সত্যতার সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শন ইহজগতে আত্মার পূর্ণতা সাধনের জন্য আবশ্যক, তদ্রূপ, যেভাবে নফসে আম্মারাহ (অবাধ্য আত্মা) এর রোগ ব্যাধিতে ও এর আবেগময় মত্ততায় চলমান ও নির্দিষ্ট মেয়াদে আপতিত বিপদাবলী দেখা দেয় বা যা কিছু প্রতিষেধক ও চিকিৎসার পরিসেবা ও পরিচর্যা রয়েছে আর যেভাবে আত্মার শুদ্ধতা ও চিত্তের শুচিতার পদ্ধতি রয়েছে আর কল্যাণসাধনকারী নৈতিক গুণাবলীর চিহ্নসমূহ, উপায়-উপকরণ ও আস্বাদন (মজাদার) এর চরমতম প্রকাশ–এ সব কিছু সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণভাবে কুরআন মজীদে ভরপুর রয়েছে। আর কেউই এমন সত্যতা, ঐশ্বরিক এমন নিদর্শন বা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত এমন সুবিন্যস্ত পদ্ধতি বা এমন কোন বিরল পাক-পবিত্রতা ও সাধ্য-সাধনাপূর্ণ পরিচর্যা দানকারী শিক্ষামালা জগতসমক্ষে উপস্থাপন করতে পারবে না, যা এই 'পবিত্র কালাম'- এ (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে) বর্ণিত হয় নাই (সুরমায়ে চশমায়ে আরীয়াঁ, পৃষ্ঠা-২৬, টীকা) ।

অতঃপর হুযূর (আ.)-এ প্রসঙ্গে বিশদ বর্ণনাও দিয়েছেন। অতএব কুরআন করীমেরই এ দাবী যে মানবাত্মাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য যে-যে পথনির্দেশনা ও সত্য প্রতিপন্ন করার আবশ্যকতা ছিল তা সবই আমার মাঝে বিদ্যমান, যদি তোমরা আমার অনুবর্তিতা করো তবে আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে সুরক্ষা পেয়ে যাবে আর আধ্যাত্মিক উন্নতির দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে ও তোমরা নিজ আত্মার পরিপূর্ণ মার্গ লাভ করবে।

আর প্রতিটি ওই শরীয়ত যার দাবী এরূপ, যৌক্তিকভাবেই তার দাবী এ-ও হওয়া উচিত যে, অসাধারণ ও অতুলনীয় উন্নতির দ্বার আমি তোমাদের জন্য খুলে দিচ্ছি আর কুরআন করীম এ দাবীও করেছে কেননা কুরআন করীমের শুরুতেই বলা হয়েছে **হুদাল্লীল মুত্তাকীন** (সূরা বাকারা আয়াত নং-৩) অর্থাৎ কেউ তাকওয়ার যে কোন উচ্চ ও উন্নততর মর্যাদায়ই পৌঁছে যাক না কেন কুরআন করীম তার জন্য তাকওয়ার আরও উন্নততর সোপান উন্মোচিত করতে থাকে। এরপর সে অগ্রসর হয়, পুণরায় সে অপেক্ষাকৃত উন্নত মর্যাদা লাভ করে। এরপরও তার চেয়ে উন্নততর আধ্যাত্মিক ধাপ তার সামনে আসতে থাকে। আবারও সেই উন্নততর স্তরে উপনীত হওয়ার আকাঙ্খা তার অন্তরে জেগে ওঠে আর কুরআন করীম তার হাত ধারণ করে ও বলে তুমি আমার আনুগত্য করো আমি তোমাকে ওই পাকপবিত্র মর্যাদার ধাপ পর্যন্ত-ও নিয়ে যাব। এভাবে 'পথ-পরিক্রমণ' এগিয়ে চলতেই থাকে এবং এর পরিসমাপ্তি নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়বস্তুকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা.) এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এই যে অসীম অনুগ্রহ ও কল্যাণ, সেই কল্যাণরাজি গণনায় সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না আর যেহেতু আঁ হযরত (সা.) এর উপর **হযরতে আহদীয়ত** (আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম) এর অসীম কল্যাণ নিহিত রয়েছে এ কারণে দরূদ প্রেরণকারীদের মধ্যে যারা আঁ হযরত (সা.) এর ব্যক্তিসত্ত্বাকে ভালোবেসে কল্যাণ কামনা করে, অনন্ত বরকত থেকে যথারীতি নিজ অনুপ্রেরণার অংশ তারা পেয়ে যায়।

এ বিষয়েই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যত্র এক জায়গায় বলেন,

> 'আমি দেখছি যে–আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও কল্যাণ বিস্ময়কর জ্যোতিরূপে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ধাবমান আর সেখানে পৌঁছে আঁ হযরত (সা.) এর বক্ষে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। সেস্থান থেকে পুণরায় অসংখ্য আলোক রশ্মিপথে তা নির্গত হয়ে প্রত্যেক হকদারের কাছে তার ন্যায্য অংশ পৌঁছতে থাকে।' (আখবার আল হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩, পৃষ্ঠা-৭, তাযকেরা দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৭৭)।

অতএব, কুরআন করীম তথা ইসলামের দাবী, আমি 'হুদাল্লিল মুত্তাকীন'–মানবাত্মাকে তার পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো দাতা। এটা এভাবে পূর্ণ হয় যে আঁ হযরত (সা.) এর সত্ত্বা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এমন এক পবিত্র সত্ত্বা যে

আল্লাহ্ তা'লার অনন্ত করুণা ও অনুগ্রহ তাঁর (সা.) প্রতি অবতীর্ণ হতেই থাকে বরং এরূপ বলা উচিত যে খোদা তা'লার পবিত্র গুণাবলীর অসীম জ্যোতির্বিকাশ তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বায় প্রতিটি মুহূর্তে প্রকাশিত হতে থাকে। তাই যে ব্যক্তিই তাঁকে (সা.) ভালবাসবে আর তাঁর (সা.) জন্য কল্যাণ ও করুণা এবং শান্তি ও সম্মান যাচনা করবে আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্তিগত ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্কের প্রতিদান হিসেবে যাবতীয় কল্যাণ থেকে তাকে প্রাপ্য অংশ দিতে থাকবেন। আর যখন সে ব্যক্তি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কল্যাণ পূর্ণ ভান্ডার থেকে কিছু অর্জন করে ফেলবে এই তত্ত্বজ্ঞানের সাথে যে, এখান থেকে অনন্ত কল্যাণরাজি লাভ করা যেতে পারে। ফলে ব্যাপকতর কল্যাণ তাঁর (সা.) থেকে লাভ করার উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তির হৃদয়ে ইচ্ছা জাগবে আর এতে সে অধিকতর আগ্রহ ভরে বেশী বেশী আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসার সাথে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করায় লেগে যাবে আর এতে তাদের উপর আরও বেশী কল্যাণ ও ভালবাসার অবতরণ শুরু হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত কুরআন করীম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন,

> কুরআন করীমের এ দাবীও রয়েছে যে–আমি অন্তহীন জ্যোতির্ময়, আমাতে সীমাহীন কল্যাণ, আমি অসাধারণ নৈকট্যপূর্ণ মর্যাদার দুয়ার সমূহ নিজেদের মান্যকারীদের ও কুরআন করীমের আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের আর আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিই।

আল্লাহ্ তা'লা যেমন কুরআন করীমে বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑨

ওয়াল্লাযিনা আমানু মাআ'হু নুরুহুম ইয়াসআ' বায়না আইদিহিম ওয়া বি আয়মানিহিম ইয়াকুলুনা রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা আ'লা কুল্লে শায়ইন কাদির (সূরা তাহরীম : আয়াত ৯)।

এই আয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে যে-যেসব ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ইসলামের আনুগত্য আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কাছে

বয়আত নেয় প্রতিদান স্বরূপ ইহজগতে তারা নূর (জ্যোতি) লাভ করে। ওই নূর যেভাবে ইহজগতে সর্বদা তার সাথে অবস্থান করে ও তাকে পথ দেখিয়ে চলে আর আধ্যাত্মিকতার পথসমূহ তাকে আলোকজ্জ্বল করে দেখিয়ে দিতে থাকে, তেমনি করে পরলোকেও এ নূর মুমিন থেকে পৃথক হবে না আর এরূপ যেন না বুঝা হয় যে, কুরআন করীমের পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলে কেবল ইহজগতে সীমাহীন কৃপার দুয়ার খুলে যায়, বরং শুধু তাই নয় মৃত্যুর পরও ওই কৃপার প্রতি নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যেতে পারে না। সে কালেও কৃপার এ দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইহজগতে যে অন্ধ হবে সে পরজগতেও দৃষ্টিহীন হবে। এখানে সে প্রেক্ষিতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, ইহজগতে যে ব্যক্তি কোন আলো ও জ্যোতি ধারণ করবে সেই জ্যোতি পরজগতেও তার সাথেই থাকবে। এর অর্থ এমন নয় যে ইহজগতে আধ্যাত্মিক উন্নতির দুয়ারসমূহ তো এমন ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত কিন্তু পরজগতে তা রুদ্ধ হয়ে যাবে আর সেখানে গিয়ে ফসল তোলার পর, সে ফল ভোগ করার যতটা সময়, কেবলমাত্র ততটুকু সময়ই তাদের দেয়া হবে, অতঃপর তার আর ক্রমোন্নতি লাভ হবে না, বিষয়টি এমন নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা মানবাত্মার জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, যে জ্যোতি, কুরআন করীমের আনুগত্যে আর আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'কল্যাণময় আধাঁর' থেকে ইহজগতে কেউ অর্জন করেছে, মৃত্যুর পরও সেটা তার সাথেই যাবে আর আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও তার ক্রমোন্নতির দুয়ারসমূহ উন্মোচিত করতে থাকবেন আর তার চলার পথকেও আলোকিত করতে থাকবেন। আর কোনস্থানেই আধ্যাত্মিক উন্নতির এ যাত্রা নিঃশেষ হওয়ার নয়। কেননা, বান্দা ও খোদার মাঝে যে ব্যবধান ও দূরত্ব তার শেষ নেই। অতএব বান্দা ও খোদার মাঝে নৈকট্যের রাস্তা যে অবস্থায় বিরাজ করছে, তা কী করে সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত করে নেয়া যেতে পারে!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

> এ আয়াতে যে বলা হয়েছে–তারা সর্বদা এটাই বলতে থাকবে, 'আমাদের আলোকে পূর্ণ করে দাও'–এটা অসীম উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ, আলোর এক পূর্ণ স্তর লাভ করবার পর, আর এক স্তর তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। তা দেখে পূর্বতন স্তর অপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে, তখন তারা দ্বিতীয় স্তরের জন্য প্রার্থনা করবে এবং সেটা প্রাপ্ত হবার পর তৃতীয় এক স্তর তাদের দৃষ্টিগোচর হবে তখন তা দেখে তারা

পূর্বের স্তরগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং পুনরায় তারা আরো উন্নততর স্তরের আকাংখা করতে থাকবে। এটাই সেই উন্নতির আগ্রহ যা **আতমিম** (অর্থাৎ পূর্ণ কর) শব্দ হতে প্রতিভাত হয় (ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১২-৪১৩)।

কুরআন করীম এমন দাবীই করেছে, আর এমনটি করেও দেখিয়েছে অর্থাৎ ইসলামে হাজার হাজার, লাখ লাখ সংখ্যায় খোদা তা'লার পবিত্র বান্দাগণ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা ইসলাম থেকে নূর (জ্যোতি) লাভ করে, যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসা থেকে এক ছিটে-ফোঁটা সংগ্রহ করে এমন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেছেন যে ইহজগতে অতুলনীয় উন্নতি সাধন করেছেন আর পরজগতে যা তাদের লাভ হবে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে, সে সবের আমরা কল্পনাওতো করতে পারি না।

হেদায়াত-এর চতুর্থ অর্থ যেমনটা আমি বলেছি শুভ পরিণাম ঘটবার অর্থে, অর্থাৎ জান্নাত লাভ হয়ে যাওয়া আর অমর জীবন লাভ করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

উলাইকা আলা হুদাম্ মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন (সূরা বাকারা, আয়াত ৬) অর্থাৎ সে সব লোক, যারা কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমলকারী, এর উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তাদের 'রাব্ব' পরিপূর্ণ প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের আশিসে পূর্ণহেদায়াত (পরিপূর্ণ পথনির্দেশনা) অবতীর্ণ করেছেন আর তারা সেই 'হেদায়াত' এর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। **ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন** ওই ব্যক্তিরাই **ফালাহ** লাভের যোগ্য। আরবী ভাষায় **ফালাহ** পরিপূর্ণ এমন সফলতা লাভ করাকে বলা হয় যাকে কোন সফলতা-ই সাফল্যের মানদন্ডে টপকিয়ে যেতে পারে না, যার মাঝে কোন প্রকারের বৈকল্য থাকে না, যা হলো গিয়ে 'একেবারে উপচে পড়া সফলতা'। আল্লাহ্ তাআলা এখানে এটা বলছেন, যে ব্যক্তি নিজ 'রাব্ব' (যিনি মানবজাতিকে প্রতিপালন করে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর যুগে এক বিশেষ উচ্চ মর্যাদায় তাদের নিয়ে আসেন আর চিন্তা-চেতনা ও বোধশক্তিতে তাদের পূর্ণতা দান করেন ও মন-মনন ও মেধায় পরিপক্কতা দান করেন) এর হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে পরিপূর্ণ এক বিজয় ও সফলতা পেয়ে থাকে আর পূর্ববর্তী সব উম্মতের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত প্রদত্ত খুতবায় আমি কাবাগৃহ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত দু'টি উদ্দেশ্যের বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছি। এক হলো এই যে **মুবারাকান**– আল্লাহ্ তাআলা চাচ্ছিলেন যে 'কাবা'কে আশিসমন্ডিত করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের সাথে বায়তুল্লাহ্ উভয় অর্থে আশিসমন্ডিত হয়ে গিয়েছে আর দ্বিতীয়ত এই যে আল্লাহ্ তাআলা চাচ্ছিলেন যে এখানে এমন এক হেদায়াতের অবতরণ ঘটান যা **হুদাল্লিল 'আলামিন** হয়। শরীয়তের বিধি-বিধানের পরিপূর্ণতার দিক থেকেও আর স্বীয় উৎকর্ষের মানদন্ডেও। আর এ প্রতিশ্রুতিও কুরআন করীমের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। নতুবা মক্কায় তো অন্য কোন শরীয়ত ছিলই না। তবে অপরাপর শরীয়তগুলো– সেগুলো না ঐ দাবী করেছে আর না ঐরূপ দাবী করতে সক্ষম। কুরআন করীমই এ দাবী করেছে আর কুরআন করীম সে দাবীকে কার্যক্ষেত্রে সাব্যস্তও করেছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ইসলামে হাজার হাজার, লাখ লাখ সংখ্যায় এমন পবিত্র ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটেছে যাদের জীবন এ কথার সাক্ষী যে, যারা-ই কুরআন করীমের অনুসরণ করে আর সে পথনির্দেশনার অনুগমন ও অনুসরণ করে থাকে খোদা তা'লা তার জন্য **হুদাল্লিল 'আলামীন** নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে খোদা তা'লার অসীম কল্যাণরাজি থেকে অংশ নিয়ে থাকে আর তার পরিণাম মঙ্গলজনক হয় আর মানবাত্মাকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য আর তার আত্মশুদ্ধি সম্পূর্ণ করার জন্য যে জিনিষেরই প্রয়োজন তা কুরআন করীমে পাওয়া যায়, কেননা সেসব ব্যক্তিরা কুরআন করীমের উপর আমল করে, আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তাদের সত্ত্বা আশিসমন্ডিত ও পরিপূর্ণ সত্ত্বায় পরিণতি লাভ করেছে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রদর্শিত কার্যকর বাস্তবায়ন, ওই কথার সাক্ষী যে বাস্তবিকই এ ব্যক্তিরা খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা আর আধ্যাত্মিক ময়দানে তাদের পদক্ষেপসমূহ সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও ওই দলে অন্তর্ভূক্ত করুন।

বায়তুল্লাহ

সত্যসাক্ষ্যপূর্ণ সুস্পষ্ট নিদর্শন
ঐকমত্যের উৎসস্থল

সর্বকালে জীবন্ত

জুমুআর খুৎবা
১২ মে ১৯৬৭

মসজিদ মুবারাক

রাবওয়া

হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, খোদার এ গৃহ এমনই সত্যসাক্ষ্যপূর্ণ এক প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন আর ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনপুষ্ট উৎসস্থল, যা সর্বকালে জীবন্ত থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণকর্ম দ্বারা এমন উম্মতে মুসলেমা প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য যাতে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামতকাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহে.) সূরা আলে ইমরানের ৯৮ নম্বর আয়াত থেকে অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করেন−

فِيهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

ফিহে আয়াতুম বায়্যিনাতুম মাক্বামু ইব্রাহীমা ওয়া মান দাখালাহু কানা আমীনান্ ওয়া লিল্লাহে 'আলান্ নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস্তাত্বাআ' ইলাইহি সাবীলান।

অতঃপর হুযূর (রাহে.) বলেন, আমি আমার প্রদত্ত খুতবাগুলোতে ওই তেইশটি উদ্দেশ্যের বিষয় বর্ণনা করছি যা কার্যকর করতে আল্লাহ্ তা'লা-ই হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে দিয়ে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত নবরূপে খাড়া করিয়েছিলেন। আর এটাও বর্ণনা করে যাচ্ছি যে, নবী আকরাম (স.)-এর মাধ্যমে সেই লক্ষ্যসমূহ কীভাবে পূর্ণ করা হয়েছে। তিনটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমার প্রদত্ত পূর্ববর্তী খুতবাগুলোতে বন্ধুদের সামনে আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছি।

পবিত্র কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের **চতুর্থ উদ্দেশ্য** বা এমনও বলা যায় যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার চতুর্থ প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে **ফিহে আয়াতুম্ বায়্যিনাতুম**−আমি জানিয়েছিলাম যে এ বাক্যাংশে হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে খোদার এই গৃহ এমনই সত্যসাক্ষ্যপূর্ণ প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনপুষ্ট কেন্দ্রস্থল- মহান উৎস, যা সর্বকালে জীবন্ত থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণকর্ম দ্বারা এমন উম্মতে মুসলেমা প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য যাতে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামতকাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে।

কুরআন করীম এ দাবী করে যে কেবল এরই আজ্ঞানুবর্তীতার ফলশ্রুতিতে কিয়ামতকাল পর্যন্ত এই দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আরো দাবী হলো, প্রত্যেক জাতিতে ও প্রত্যেক যুগে এমন লোকেরা জন্মগ্রহণ করতে থাকবে যারা এর কল্যাণ ও আশিস থেকে ভাগ নেবে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাধ্যমে স্বীয় নিদর্শনসমূহের প্রকাশ ঘটাতে থাকবেন।

আয়াতে বায়্যিনাত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দেয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলো এমন 'আয়াতে বায়্যিনাত' ছিল, যার সম্পর্ক কেবল সেই জাতি ও সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র মানবজাতির সাথে সে-সবের সম্পর্ক ছিল না আর ছিল না সকল যুগের সাথেও। কিন্তু উদ্ধৃত এই আয়াতে বিষয়বস্তু তো এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সাথে– সকল জাতি, গোষ্ঠী ও সকল যুগের সাথে, এজন্য এ বিষয়বস্তুর গোড়াতেই–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

ইন্না আওওয়ালা বাইতিঁও উযিআ' লিন্নাসি লাল্লাযি বিবাক্কাতা মুবারাকাওঁ ওয়াহুদাল্ লিলআ'লামীন (আলে ইমরান আয়াত নং-৯৭)।

উক্ত আয়াত– ইন্না আওওয়ালা বাইতিঁও উযিআ' **লিন্নাস**-এর 'লিন্নাস' দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

যদিও পূর্বকালের উম্মতদেরও আয়াতে বায়্যিনাত প্রদান করা হয়েছিল তবে সকল জাতি-গোষ্ঠী ও সর্বযুগের সাথে যার সম্পর্ক, তা কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-কে প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন–

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

বাল হুওয়া আয়াতুম বায়্যিনাতুম ফী সূদূরিল্ লাযীনা উতুল ই'লমা, ওয়া মা ইয়াজহাদু বি আইয়াতিনা ইল্লায্ যোয়ালিমূন (সূরা আনকাবুত : ৫০)।

এ আয়াতে করীমায় এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে এমন লোক সর্বদা সৃষ্টি হতে থাকবে যাদের পুর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় রহস্যাবলী পূর্ণাকারে ও পরিপূর্ণভাবে তাদের দান করা হতে থাকবে এবং ওই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের কারণেই তাদের অন্তরে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ভয়ও পাওয়া যাবে। এর ফলে তাদের অন্তরে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসাও সৃষ্টি করে দেয়া হবে, এতে করে তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশ পালনকারী এবং তাঁকে সম্মান-ভক্তি ও শ্রদ্ধাকারী হয়ে যাবে। যেহেতু এমন লোক সৃষ্টি হতেই থাকবে, এজন্য ওই **আয়াতে বায়্যিনাত** কুরআন

করীমের সাথে যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, বরং বলা যেতে পারে যে কুরআন করীমের সমগ্র দেহাবয়ব জুড়েই মূর্তিমান আয়াতে বায়্যিনাত বিদ্যমান। ওসব আয়াতে বায়্যিনাত তাদের বুকভরা ভালোবাসা থেকেও নিঃসরিত হতে থাকবে ও কুরআনের মহত্ত্বের ওই আলো দ্বারা জগত সর্বদা আলোকিত হতে থাকবে। তবে উম্মতে মুসলেমার মধ্য থেকে এমন কিছু লোকও সৃষ্টি হবে, যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অত্যাচারী হবে, কুরআন করীমের কল্যাণের ওই দুয়ারগুলো তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য রুদ্ধকারী হবে। এমন লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার **আয়াতে বায়্যিনাত** অবশ্যই প্রকাশ পাবে না, তবে **উতুল ইলমা** অর্থাৎ ওমন লোক, যাদেরকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী জ্ঞান প্রদান করা হবে এরূপ লোক সর্বদা উম্মতে মুসলেমাতে সৃষ্টি হতেই থাকবে এবং **আয়াতে বায়্যিনাত**-এর দুয়ার কিয়ামতকাল পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

নিছক এক দাবী নয় এটা বরং ইসলামের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে আল্লাহ্ তা'লা-ই ইসলাম ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য পৃথিবী ও আকাশ এবং সকল যুগকে নিদর্শন দ্বারা ভরে দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

> সত্য ধর্মের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো- যে কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের বীজ গোড়াতে এর মাঝে বপিত হয়েছিল এটা মরে না গিয়ে বরং সেসব কল্যাণ ও মহত্ত্বের আশিসসমূহ মানবকুলের মঙ্গলের জন্য দুনিয়ার শেষ কাল পর্যন্ত এর মাঝে বিদ্যমান থেকে যাবে, যাতে বর্তমান নিদর্শন বিগত নিদর্শসমূহের সত্যায়নকারী হয়– সত্যতার আলোকে, কেচ্ছা কাহিনী রূপে নয়। অতএব আমি বিস্তৃত এক পর্যবেক্ষণ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখছি যে, আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে নবুয়তের দাবী করেছেন এবং জগত সমক্ষে দলীল-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করেছেন আজও তা যথার্থরূপে বিদ্যমান আর এর অনুসারী ও অনুবর্তীতাকারীরা এখনও তা পেয়ে থাকে যাতে সেই আধ্যাত্মিক অবস্থানে তারা পৌঁছুতে পারে এবং যথার্থরূপে খোদা দর্শনের সৌভাগ্য তাদের লাভ হয় (তবলীগে রেসালত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪, প্রচারপত্র ১৪ জানুয়ারী ১৮৯৭)।

একই ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আব্দুল্লাহ্ জেমস নামক এক খ্রিষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত পুস্তকে ‘তাসদীকুন্ নবী’ শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেন–

> কুরআন শরীফের চতুর্থ ঐশী নিদর্শন হলো এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও ছাপ যা সর্বদাই এর মাঝে সংরক্ষিত ও চলমান রয়েছে। অর্থাৎ এর মান্যকারী ও আজ্ঞাবাহী অনুবর্তীতাকারীরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয় মর্যাদার স্তরসমূহে পৌঁছুতে থাকে ও আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হয়। খোদাতাআলা তাঁদের দোয়া শুনেন ও তাদেরকে কল্যাণময় আশিসপূর্ণ সাড়া দিয়ে থাকেন। কখনও কখনও নবীদের ন্যায় অজানা গোপন রহস্যের ভেদ ও তথ্যাবলীও তাদেরকে জানান ও শেখান এবং নিজের সমর্থন ও সাহায্যের নিদর্শন দ্বারা অপরাপর সৃষ্টদের মধ্য থেকে তাদেরকে নির্বাচিত করেন। এটাও এমনই নিদর্শন যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে চলমান রয়েছে এবং সর্বদা প্রকাশিত হয়েও আসছে, এমন কী এখনও তা প্রমাণিত বাস্তব ও প্রকৃতই উপস্থাপিত (প্রাগুক্ত পুস্তক পৃষ্ঠা-২৩)।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ‘কিতাবুল বারিয়্যা’ পুস্তকে বলেন,

> “ইসলামে– যেরূপে, যেভাবে আর যে পন্থায়, ইসলামের সমর্থনে ও সাহায্যে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতা সাব্যস্ত করতে এই উম্মতের আউলিয়াগণের মাধ্যমে ঐশী নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়েছে এবং আজও হয়ে চলছে অনুরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধর্মসমূহে অবশ্যই নেই। ইসলামই এমন এক ধর্ম, ঐশী নিদর্শনের দ্বারা সর্বদা যার উন্নতি হয়েই চলছে এবং এর অগণিত আলোকধারা ও আশিসময় কল্যাণ খোদা তা'লার সান্নিধ্য ও নৈকট্য দান করে তা দেখিয়েও দিচ্ছে। অবশ্যই জেনে রাখো, ইসলাম স্বীয় ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোন যুগেই লজ্জাবনত মুখে গ্লানি নিয়ে পিছু হটেনি” (কিতাবুল বারিয়্যা, পৃষ্ঠা ৬৭, প্রথম সংস্করণ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৩)।

এ প্রাসঙ্গিকতায়ই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ সত্তাকে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ওই **আয়াতে বায়্যিনাত**-এর লাখ লাখ সত্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্তা, তাঁর (আ.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের

সত্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন ছিল, তরতাজা নিদর্শন সমূহ আকাশ হতে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতো। তা কেবল ওই চোখ দর্শন করা থেকে বঞ্চিত হত, যার উপর গোড়ামিপূর্ণ পূর্ব বদ্ধমূল ধারণার পট্টি বাঁধা থাকতো। সামান্যতম বোধ ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা সংস্কারমুক্ত, তারা এই প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতে পারতো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাথেই ওই আয়াতে বায়্যিনাত নিঃশেষিত হয়ে যায়নি বরং ধর্ম পুণর্জীবিত হওয়ার ফলে ইসলামের অভ্যন্তরে এক সতেজ সজীবতার সৃষ্টি হয়েছে। ওই দুয়ার যা কতক লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদের জন্য নিজেরাই রুদ্ধ করে রেখেছিল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা উন্মুক্ত সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন যে ওটা বন্ধ নয়। তাঁর (আ.) পরও তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে নিদর্শন প্রদর্শনের এই ধারা চলমান রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাযি.) এর জীবন ওই মহান ব্যক্তিগণের জীবন-ই ছিল, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আলোচিত আয়াতের **উতুল ই'লমা** বাক্যাংশে উল্লেখ করেছেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযি.)র মর্যাদা তেমনই ছিল। জগত তাঁর (রাযি.) মাধ্যমে হাজার হাজার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে। এখনও সেই মর্যাদার প্রবেশ দ্বারটি বন্ধ নয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা, ফজরের নামাযের কাছাকাছি সময় ইস্তেগফারে রত ছিলাম, এক ভয় ও শঙ্কা আমাকে আচ্ছন্ন করছিল, স্বীয় প্রভূ-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা ও মার্জনা ভিক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে দোয়ায় নিয়োজিত ছিলাম, অকস্মাৎ অনুভব করলাম যে অদৃশ্য এক শক্তি আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছে। এ অবস্থায় আমার মুখে এ কথা উচ্চারিত হতে থাকলো যে **ক্বিয়ামে দ্বীন** পরবর্তীতে এক ধাক্কা আমার গোটা শরীর নাড়িয়ে দেয় আর আমি সজাগ অবস্থায় এসে যাই। এর মর্ম আমি এটা বুঝি যে, চলমান এ খুতবার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে জামা'তের সামনে আমি যে কর্মসূচী রাখতে যাচ্ছি তার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং এর স্থায়িত্বের উপকরণ সৃষ্টি করবেন ইনশাআল্লাহ্!

হাজার হাজার নিদর্শন তো বিদ্যমান রয়েছেই, যা মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা চলমান রেখেছেন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, রাশেদ খলীফা বিলীনতায় নিজ সত্ত্বাহারা এক আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান করেন, এ জন্য সাধারণভাবে ওই সব বিষয় তিনি প্রকাশ করেন না– যে সব বিষয় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একান্ত ভালোবাসার প্রকাশক হয়ে থাকে, তবে এমন বিষয় ছাড়া যেগুলোর সম্পর্ক জামাতের সাথে রয়েছে এবং যে সব

বিষয় জানিয়ে দেয়া জরুরী। নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এ কথা বলতে পারি যে খোলাফায়ে রাশেদীনদের আল্লাহ্ তা'লা সর্বদাই নিষেধ করেন যে, নিজেদের নৈকট্য লাভের কথা যেন খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনামূলক বর্ণনা এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনান্তে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে 'ইতিহাস' পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মাত্র গুটি কয়েক **আয়াত বায়্যিনাত** সংরক্ষণ করেছে। যেমনটি আমার পর্যবেক্ষণ হলো, ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) এর যুগে সাধারণভাবে প্রদর্শিত নিদর্শনের সংখ্যা 'দশ' এর অধিক নয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতের যে খবর বা শুভ সংবাদ হযরত ওমর (রা.) কে দেয়া হয়েছিল তা থেকে মাত্র গুটি কয়েক ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে বেশী নয়, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নির্দেশনামূলক বর্ণনায় বলেছেন, ভবিষ্যতের হাজার হাজার সংবাদ লাভ এবং ঐশী বাক্যালাপ ও কথপোকথন পূর্ববর্তী ওই বুযুর্গ খোলাফায়ে রাশেদীনগণের সাথেও হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশনামূলক বর্ণনা যথার্থ রূপেই সঠিক ও সত্য, এটা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইতিহাস এ প্রসঙ্গে নীরব, এজন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে ওই বুযুর্গগণ এসব বিষয় প্রয়োজনের মুহূর্ত ছাড়া জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতেন না। কেবলমাত্র ওই বিষয়গুলো ছাড়া যার সম্পর্ক জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত এবং যেগুলো জানানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমনটি একবার জামাতের বিরুদ্ধে যখন ফেৎনা ফাসাদ দেখা দিয়েছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযি.) বলেছিলেন, "যে বিষয়গুলো আমার জানা রয়েছে যদি আমি তা প্রকাশ করে তোমাদের জানিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের জীবিত থাকাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।" (উক্তিটি হুবহু আমার স্মরণ নেই তবে বিষয়বস্তু এমনই ছিল)

আমি এটা বলছিলাম যে **ফিহে আয়াতুম বায়্যিনাত**-এর যে প্রতিশ্রুতি ইব্রাহীম (আ.) কে দেয়া হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (স.) ওই প্রতিশ্রুতি পূরণকারী এবং ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী। আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনকাল ব্যাপী জগত আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাঁর (আ.) পর তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে, আহমদীয়া জামা'তের আরও অন্যান্য যে বুযুর্গগণ রয়েছেন তাদের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন প্রদর্শন করেই চলছেন। এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর কল্যাণ ও আশিসের বদৌলতে তাঁর (আ.) মান্যকারীদের মাঝে এর প্রকৃত তাৎপর্য

বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে এ ধরণের বিষয় সাধারণভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়, কেননা এর ফলে আমিত্বের আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর কখনও কখনও এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, এভাবে মানুষ না আবার আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ক্রয়কারী হয়ে যায়।

অতএব, কুরআন করীম থেকে এবং যে আদর্শ ও নমুনা উম্মতের আউলিয়াগণ থেকে ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং যে ব্যবহার আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (স.)-এর প্রেমিকদের সাথে ও তাঁর (আল্লাহ্ তা'লার) সন্তুষ্টির পথে নিয়োজিত আত্মোৎসর্গকারীদের সাথে করে থাকেন তাথেকে এটা প্রতীয়মান হয়ে যায়, আর তা অস্বীকার করার জো নেই যে, সকল জাতির মধ্যে ও সকল যুগে **আয়াত বায়্যিনাত** সগৌরবে বিদ্যমান এবং এর সম্পর্ক কেবল মুসলমানদের সাথে, অন্য কোন ধর্ম এরূপ দাবী করতে পারে না এবং এটা সত্য প্রতিপন্ন করার সামর্থ্যও রাখে না।

পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের পঞ্চম উদ্দেশ্য– মাকামু ইব্রাহীম

এখানে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, ইব্রাহীম (আ.) এর মর্যাদাপূর্ণ এই অবস্থান থেকে আল্লাহ্-প্রেমিক এমন জামা'ত সৃষ্টি হতেই থাকবে, যারা জাগতিক মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের যাবতীয় ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কুরবানী করে আত্মবিলীনতার মর্যাদা অর্জনকারী হবে। সঠিকভাবে অনুধাবন করে থাকলে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, **আয়াত বায়্যিনাত** এবং **মাকামে ইব্রাহীম**-এর মধ্যে স্বচ্ছ ও গভীর এক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের মধ্যে আয়াতে বায়্যিনাত-এর এক সমুদ্র সর্বদা সচল রয়েছে, কাজেই উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে সম্ভব হয়েছে হাজার হাজার, লাখ লাখ এমন বুযুর্গগণের সন্ধান পাওয়া, যারা **মাকামে ইব্রাহীম** অর্জনকারী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে **মাকামে ইব্রাহীম** হলো **মাকামে মুহাম্মদী**-এর ছায়া (যিল্ল) বা প্রতিবিম্ব। দৃষ্টি ওই মর্যাদার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যা মুহাম্মদ রাসুলূল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদার স্তর, এটা তো সম্ভব নয়। তবে সেই স্তরের অধঃস্তন মর্যাদার যে স্তর, তা হলো **মাকামে ইব্রাহীম**। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এক প্রতিবিম্ব রূপেই ওই আয়াত বায়্যিনাত থেকে ভাগ নিয়েছেন। কুরআন করীম এ দাবী করে যে, আমার মান্যকারীদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় এমন ব্যক্তিদের সৃষ্টি হবে যারা আত্ম-বিলীনতার ওই মর্যাদা লাভকারী হবে। আত্মবিলীনতার মর্যাদা, সেটা আবার কী জিনিস!

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

প্রেমময় সত্ত্বা, মর্যাদার এক স্তর, যার উপর পবিত্র কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ মান্য ও পালনকারীকে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে এবং তার স্পন্দনবাহী ধমনী ও শিরায় ঐশীপ্রেম এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে রাখে যে, ওটাই তাঁর নিজ জীবন সত্তার মূল উপাদান বরং তার জীবনেরও জীবন (জানেরও জান)এ পরিণত হয়। প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতি এক অসাধারণ রকমের বিস্ময়কর ভালোবাসা তার অন্তরে স্ফুরিত হয়ে দোলা দেয়, অসাধারণ অলৌকিক এক আকর্ষণ তার পরিশুদ্ধ হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে, অপরাপর সবকিছু থেকে কর্তিত, বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করে নিয়ে ঐশীপ্রেমের উদগ্র বাসনা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে থাকে, যা সাহচর্যে অবস্থানকারীদের স্বভাব-চরিত্রে, গুণাবলীতে, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতেও পরিস্ফুটিত ও প্রকাশিত হয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত দলীলরূপে দৃশ্যমান হয়... এবং সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সততা ও একনিষ্ঠতার প্রতীক চিহ্ন এটাই যে, সবক্ষেত্রেই সে তার প্রেমাস্পদকে অবলম্বন করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আবার যদি তাঁর পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ এসে উপস্থিতই হয়, তবে প্রেমময় সত্ত্বার বিজয় প্রকাশের সাক্ষ্যদানকারী হয়ে সেটাকে পুরস্কাররূপে গ্রহণ করে নেয় এবং বিপদ-আপদকে স্নিগ্ধ মজাদার মিষ্ট পানীয়ই মনে করে। কোন তরবারীর তীক্ষ্ণ ধার, তার আর তার প্রেমাস্পদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঢুকিয়ে দিতে পারে না। কোন সর্বোচ্চ বিপদ আপদও তাকে তার সেই আপন প্রেমাস্পদের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। এটাকেই (প্রেমাস্পদের স্মরণকে) নিজ জীবন বলে সে জানে এবং তাঁরই প্রেমের মাঝে স্বাদ ও মজা পায় ও তাঁর সত্ত্বাকেই অস্তিত্ববান বলে বিশ্বাস করে ও তাঁরই স্মরণ ও জপগাঁথাকে জীবনের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে নেয়। চাওয়ার যদি থাকে তো তাঁকেই, সুখ-আনন্দ পাওয়ার থাকলে তাঁরই কাছে, সমগ্র জগতের মধ্য থেকে তাঁকেই আপন করে নেয় আর নিজেকে তাঁরই জন্য নিবেদন করে রাখে। বেঁচে থাকা তাঁরই জন্য, মরণটাও তাঁরই উদ্দেশ্যে, জগতে বাস করেও ইহজগতের নয়; সত্ত্বা নিয়ে অবস্থান করলেও আত্মহারা। কার্যতঃ মান-সম্মান, সুনাম বা নিজের আরাম-আয়েশ কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কী নিজ জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ নেই **একমাত্র সত্ত্বার** সান্নিধ্যের সেই একজনকে

> পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সর্বস্ব দিয়ে সবকিছু খুঁইয়ে বসে। অদম্য অন্তর্জালায় দগ্ধিভূত হয়েও বর্ণনার ভাষা তার নেই যে, কেন এই দহন, মর্মযাতনায় বাকরুদ্ধ ও হতবিহ্বল হয়ে সব রকম বিপদাবলী, অপমান ও বদনাম সয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে এবং এতেই সে মজা ও স্বাদ পায় (বরাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫১, পাদটীকা নং ৩)।

এমনিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই পবিত্র জামা'তকে এভাবে চিত্রিত করে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতিশ্রুতি ও শুভ সংবাদ অনুযায়ী যেমনটা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন–

> লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মাগণের পর্যবেক্ষণ এটাই যে কুরআন শরীফের অনুগমন ও অনুবর্তীতায় হৃদয়-অন্তরে ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে দয়াময় প্রভূর সাথে অদ্ভূত অসাধারণ এক সংযোগ সাধিত হয়ে যায়। ....আর পারস্পরিক এই মিলনে ঐশী প্রেমের মজাদার এক স্বাদ তাদের অন্তরে সংস্থাপিত হয়ে সংরক্ষিত হয়, এ অবস্থায় যদি তাদের সার্বিক অস্তিত্ব ও দেহ-সত্ত্বাকে দুঃখকষ্ট ও বিপদাবলীর হামানদিস্তায় পেষণ করে **বামার প্রেস** (প্রচন্ড চাপদ্বারা তুলার গাঁইট বাঁধার যন্ত্র বিশেষ)-এর ভিতর দিয়ে প্রচন্ড চাপে নিংড়ে নেয়া যায় তাহলে প্রাপ্ত সেই নির্যাসে ঐশীপ্রেম-খোদার ভালোবাসা ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্বের সন্ধান মিলে না। পার্থিবতায় লিপ্ত জগত এ অভিজ্ঞান রাখে না, কারণ উন্নততর ও মহত্ত্বর সেই অবস্থান পার্থিবতা থেকে বহু যোজন দূরে বিরাজমান (সুরমা চশমায়ে আরীয়াঁ, টীকা– পৃষ্ঠা-৩১)।

এটাই হলো সেই মাকামে ইব্রাহীম, যার প্রতিশ্রুতি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল। এ শুভ-সংবাদই হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বীয় প্রভূ-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা যিনি 'সত্য প্রতিশ্রুতি' দানকারী, তিনি সেই প্রতিশ্রুতি সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন এবং উম্মতে মুসলেমায় লক্ষ লক্ষ এমন পবিত্র সত্ত্বার অধিকারী ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন যারা মর্যাদায় উন্নতি লাভ করে মাকামে ইব্রাহীম পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন।

ষষ্ঠ প্রতিশ্রুতি– যা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল তা এ আয়াতের **ওয়ামান দাখালাহূ কানা আমিনা** অংশে বিধৃত হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছিলাম, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে যারা বায়তুল্লাহ-য় প্রবেশ করবে অর্থাৎ

নির্ধারিত সেই ইবাদত সম্পন্ন করায় যার সম্পর্ক খোদা তা'লার পবিত্র এ গৃহের সাথে রয়েছে, ইহজগতের ও পরকালের নরক থেকে মুক্ত হয়ে তারা খোদাতাআলা প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্রয়ে এসে যাবে, তাদের বিগত সকল পাপ মার্জনা করা হবে এবং নরকের অগ্নি থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। 'ওয়ামান দাখালাহূ কানা আমিনান' যে কেউ এ গৃহে প্রবেশ করলে, ওই অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে (যা খোদাতাআলা অস্বীকারকারীদের জন্য প্রজ্বলিত করে রেখেছেন)। যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা নমলে উল্লেখ করেছেন,

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۹۰﴾

ওয়া হুম্ মিন ফাযাইঁ-ই ইয়াওমাইযিন আমিনূন (আয়াত নং ৯০) অর্থাৎ ইসলামের পথনির্দেশনা অনুযায়ী আমলে সালেহ (সময়োপযোগী সৎকর্ম) সম্পাদনকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবেন ও শেষ প্রলয়ের শিঙ্গাধ্বনি বেজে উঠা কালে এমন লোকেরা নরকের শাস্তি পাবার ভয় থেকে শঙ্কামুক্ত থাকবে। সে সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এ শুভ-সংবাদ দান করবেন যে, তোমাদেরকে নরকের চুল্লির দিকে ধাবিত করা হবে না বরং জান্নাতের পানে সাদরে আমন্ত্রণ করা হবে। অতএব কোনই ভয় বা শঙ্কা করো না।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা অপর এক স্থানে বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿۴۶﴾ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾

ইন্নাল মুত্তাক্বীনা ফী জান্নাতিঁও ওয়া উ'ইউনিন। উদ খুলূহা বিসালামিন আমিনীন্ (সূরা আল হিজর, আয়াত : ৪৬, ৪৭)।

খোদাভীরুগণ অবশ্যই বর্ণাঢ্য ফুলে শোভিত বাগান ও ঝর্ণাধারা সুশোভিত গৃহে প্রবেশ লাভ করবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা প্রশান্তির সাথে ভয় ও শঙ্কামুক্ত হয়ে সে স্থানে প্রবেশ করো। এই হলো সেই পূর্ণ নিরাপত্তা যা কুরআন করীমের মাধ্যমে, এর পরিপূর্ণ অনুগতদের লাভ হয়ে থাকে।

তিঁনি (আল্লাহ্) বলেন, **মান দাখালাহু কানা আমিনান** বাস্তবিক পক্ষে এই একই কথা আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (স.)কেও বলেছেন।

সেই সাথে এ-ও বলেছেন, আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম–

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ

লাতাদ্ খুলুন্নাল মাসজিদাল হারামা ইনশাআল্লাহু আমিনীন (সূরা আল ফাতাহ, আয়াত : ২৮) অর্থাৎ তুমি পবিত্র মসজিদে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করবে আর সে প্রতিশ্রুতি পূরণও হয়েছে।

দৃশ্যতঃ এর এক ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ্ তা'লাই মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও অবস্থা সৃষ্টি করে দেন আর যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই মক্কার কাফিরেরা (যারা নিজেদের সারাটা জীবন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতেই লেগে রয়েছিল) অস্ত্র সমর্পন করলো আর ফিরিশতারা যারা উর্ধ্বালোক থেকে অবতরণ করলো, তা এদের অন্তরে এতটা ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করলো যে তাদের যুদ্ধের সাহসই রইল না।

কিন্তু এর তাৎপর্যপূর্ণ অপর একটি অর্থ এ-ও যে, তোমরাই ওই উম্মত (জাতি) যারা এ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দানকারী যা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে এ বাক্যের দ্বারা করা হয়েছিল যে, 'ওয়ামান দাখালাহূ কানা আমিনান', অর্থাৎ যে এতে প্রবেশ লাভ করবে সে-ই নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাবে। তোমাদের মাধ্যমেও সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেয়েছে। আমি এরই বিশদ বর্ণনা করছি যে, এ প্রতিশ্রুতির সবটা এমনই যার সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সাথে– প্রত্যেক জাতি ও প্রতিটি যুগের সাথেও। কোন বিশেষ জাতির সাথে বা যুগের মধ্যে এটা বিশেষায়িত বা সীমাবদ্ধ নয়।

তাহলে **মান দাখালাহূ কানা আমিনান**-এর অর্থ এটা দাঁড়ালো যে দুনিয়ার যে কোন জাতির সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকুক না কেন, যে কোন যুগের সাথেই কাল কাটাক না কেন, যে কেউই **মানাসেক-এ-হজ্জ** (হজ্জের নিয়ম-কানুন) একাগ্রতার সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবে, নরকের অগ্নি থেকে সে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূল করীম (স.) বলেছেন, **হাজ্জা ফালাম ইয়ারফাছ ওয়া লাম ইয়াফসুক গুফেরালাহু মা তাকাদ্ দামা মিন যাম্বিহী** (মনে রাখা উচিত যে 'ইয়ারফাছ' ও 'ইয়ারফেছ' এবং ইয়াফসুক ও 'ইয়াফসেক' আরবী ভাষায় শব্দগুলো দুভাবেই বলা হয়ে থাকে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি নোংড়া ও বাজে কথা পরিহার করে চলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করে ও মানাসেক-এ-হজ্জ পালনকালে বাজে কথা থেকে আত্মরক্ষা করে– এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এটা যে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা

এমনই পবিত্র যে বাজে কথা তার মুখে আসেই না। এর তাৎপর্য এটা নয় যে অবশিষ্ট এগারো মাস জুড়ে সে সবরকমের অশালীন বাজে কথা বলতেই থাকে আর কেবল এ (হজ্জব্রত পালনের) দিনগুলোতে অশালীন কথা-বার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। বরং উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এটাই যে, যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এতটাই পুত-পবিত্র হয়ে গেছে এবং নোংড়া অপবিত্রতা আর বাজে কথা অন্তর থেকে এত দূরে নির্বাসিত হয়েছে যে, নোংড়া কথা তার মুখে আসতেই পারে না। সে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সংশোধন ও সন্ধির পথ থেকে সরে যায়নি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুনের বাইরে না গিয়ে বাধ্য-বাধকতার সাথে তা পালন করে আর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখায় প্রচেষ্টারত থাকে– একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে। তদ্রুপ গভীর মনোনিবেশপূর্ণ আমলের সাথে নিষ্ঠাবান শিষ্টাচারপূর্ণ আমল করে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-য় হজ্জ পালন করে তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে তার বিগত সকল পাপ মোচন করা হবে। এভাবে যার অতীতের যাবতীয় পাপের মার্জনা হয়ে যাবে, নিশ্চিত তাকে নরকের অনল থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

আরও এক পন্থায় মানুষ ইহজগতে ও পরলোকে নরকের অনল থেকে রক্ষা পেয়ে যায় আর তা এভাবে যে **মান দাখালাহূ** যে মাকামে ইব্রাহীমে প্রবেশ করে **কানা আমিনান**-আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শান্তি ও স্বস্তি এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বলয়ে সে এসে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

> খোদার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি ও মহিমা এবং ক্ষমতা ও পরাক্রম রয়েছে... কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর মহিমা ও পরাক্রমের এ রহস্য তার কাছেই প্রকাশিত হয়, যে তাঁরই হয়ে যায়। তিঁনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তার প্রতিই দিয়ে থাকেন, যে ব্যক্তি নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনে আর তাঁরই আস্তানায় গড়াগড়ি দিতে থাকে– নগন্য ও অবহেলিত নিশ্চল এক কণার মত, যা অবশেষে মুক্তায় রূপ নিয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, আর স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বিশ্বস্ততাপুর্ণ প্রেমের তেজস্ক্রিয়তায় নমনীয় ও বিগলিত হয়ে তাঁরই পানে ছুটতে থাকে। তখন তিঁনি বিপদাপদে তার খোঁজ-খবর নেন, আর শত্রুদের হীন পরিকল্পনা ও গোপন ষড়যন্ত্র থেকে আশ্চর্য্যজনকভাবে তাদের রক্ষা করেন ও মর্যাদার অবমাননা হওয়া থেকে তাদের হেফাযত করেন। তিনি স্বয়ং তাদের

তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক হয়ে যান। এমন সব বিপদাবলী আপতিত হয় যাতে মানুষের কিছুই করার থাকে না। সেক্ষেত্রেও তাঁর সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে তিনি তাদের সহায়তা দান করেন। কত না কৃতজ্ঞ থাকার ব্যাপার! আমাদের খোদা বড়ই দয়াবান ও মহা পরাক্রমশালী খোদা। এরপরও কী তোমরা এমন প্রিয় বান্ধবকে পরিত্যাগ করতে পারো! নিজ আত্মাকে অপবিত্র করতে তাঁর বিধি-বদ্ধ ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করতে থাকবে! অপবিত্র জীবন ধরে রেখে বেঁচে থাকাটার চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টি 'সাথী' করে মৃত্যুবরণ করাটাই আমাদের জন্য শ্রেয় (আইয়্যামুস সুলাহ, পৃষ্ঠা-১০৪)।

এটা হলো সেই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা যা ওই ব্যক্তিরই অর্জন হতে পারে, যে নিজের উপর এক মৃত্যু আনয়ন করে অনস্তিত্বের পোশাক নিজ গায়ে জড়ায় ও মাকামে ইব্রাহীম-এ প্রবেশ লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লার সেনা-সামন্তরা তখন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে থাকে ও সব রকম বিপদ আপদ থেকে তাকে সুরক্ষা প্রদান করে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগতদের উপর দু'টি দাবানলকে বিজয়ী হতে দেন না। একটি হলো তাঁর ওই বান্দারা যারা প্রেমাগ্নিতে ভষ্মীভূত হয়ে বিলীনতার স্তর যখন লাভ করে তখন অপর দাবানলের দুয়ার তাদের জন্য রুদ্ধ করে দেয়া হয়। আবার ওমন অনুগতরাও আছে যারা (আল্লাহ্ তা'লার) প্রেম-ভালোবাসার কোন ভ্রুক্ষেপই করে না, তারা তাঁর দান ও অনুকম্পায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী নয় বরং তাঁর কৃপাসমূহের অস্বীকারকারী, এরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে একান্তভাবে দুনিয়ামুখী লালসায় নিমগ্ন হয়ে গেছে। তাঁকে প্রেমাস্পদ বানাবার পরিবর্তে দুনিয়ার চাকচিক্যকে, পার্থিব জগতের সম্পর্ককে নিজের প্রেমাস্পদ নির্ধারণ করে নিয়েছে, এমন লোকদের প্রতি খোদার সুরক্ষার অবতরণ হয় না, তাঁর সেনা সদস্যরা অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান তো করেই না বরং নরকের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দাবানল তাদের ঠিকানায় পরিণত হয়।

অতএব, দু'টি দাবানল খোদার অনুগতদের উপর নিপতিত হয় না। এটা তাদের স্বনির্ধারণ যে, তারা নিজেরাই প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার অনল পসন্দ করে মন্দসমূহকে দগ্ধিভূত করবে, স্বীয় আশা আকাঙ্ক্ষা, নিজ সত্ত্বা ও নিজের প্রেমিককে এমনকি আপন পরিবার পরিজন ও সম্পর্ককেও ছাড়বে; নাকি খোদার প্রেমের চাইতেও পার্থিব জগতের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বহস্তে নিজের জন্য জাহান্নামের দুয়ার খুলে নিবে।

সপ্তম প্রতিশ্রুতি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল যে, কেবল তোমার বংশধরদের উপরই এই হজ্জ ফরয থাকবে না বরং এমন এক নবীর আবির্ভাব এখানে ঘটানো হবে যার শরীয়ত বিধি-বিধান বিশ্বজনীন হবে আর সেই শরীয়ত অবর্তীণ হওয়ার পর জগতের জাতিসমূহের উপর হজ্জ ফরয (অবশ্য পালনীয়) করে দেয়া হবে আর এভাবে খোদার এ পবিত্র গৃহকে সৃষ্টির কেন্দ্র **মরজএ' খালাইক ও মরজএ' আলম-** ইহজগৎ ও পরজগতের কেন্দ্র বানিয়ে দেয়া হবে। অতএব আমরা দেখতে পাই হযরত নবী আকরাম (স.)-এর আগমনের পূর্বে এ প্রতিশ্রুতি পুর্ণ হয় নাই। তবে নবী করীম (স.) যখন আবির্ভূত হলেন আর কুরআনের শরীয়ত তাঁর (স.) উপর অবতীর্ণ হলো তখন ওই শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাই মানবজাতির উপর 'হজ্জ'কে ফরয (বাধ্যতামূলক) করে দিলেন। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا
تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ

আলহাজ্জু আশহুরুম্ মা'লূমাতুন ফামান্ ফারাদ্বোয়া ফীহিন্নাল হাজ্জা ফালা রাফাছা ওয়া লা ফুসুক্বা ওয়ালা জ্বিদালা ফিল হাজ্জ; ওয়া মা তাফআ'লূ মিন খায়রিয়্য ইয়া'লাম্হুল্লাহ্ (সূরা বাকারা আয়াত : ১৯৮)।

অর্থাৎ হে মানবজাতি, তোমরা স্মরণ রেখো যে হজ্জের মাস সকলের চেনা জানা ও পরিচিতির জন্য। অতএব যে কেউ হজ্জকে নিজের উপর ফরয মনে করে হজ্জ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে সে হজ্জের দিনগুলোতে (অনুরূপ অন্যান্য দিনগুলোতেও) স্থূল কামনা বাসনার কোন কথা বা অকৃতজ্ঞ মন্দ কোন কথা বা কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদের কথা বলবে না। কেননা এটা বৈধ নয়। আরও বলেছেন, সৎকর্ম যেটা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ অবশ্যই তার মর্যাদা ও উদ্দেশ্যকে শনাক্ত করে ফেলবেন, তিনি এটা বিবেচনায় আনবেন না যে তোমার বংশগত সম্পর্ক শ্বেতাঙ্গদের সাথে না কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে, বরং তুমি যে কোন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যই হও না কেন, ভূপৃষ্ঠের পশ্চাৎপদ কোন অংশের বাসিন্দাই হও না কেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে **লাব্বায়েক** (আমি উপস্থিত) বলে হজ্জকে খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত মনে করবে;

আর যখন সেই শর্ত তোমার স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করবে যার সম্পর্ক রয়েছে হজ্জ করার সাথে আর সেই ফরয (অবশ্যকরণীয়) কে বাধ্যতামূলক জেনে তোমরা হজ্জ করবে আর হজ্জ পালনকালীন সময়ে ওই যাবতীয় নির্দেশনা যথোপযুক্তভাবে পালন করবে– যে সমস্ত পথ নির্দেশনা আল্লাহ্ তা'লাই এ প্রসঙ্গে তোমাদের দিয়েছেন। অতএব, হে মানব সকল! এটা শুনে নাও যে সৎ কাজ-কর্ম যা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ়ভাবে তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তিনি তোমাদের পূণ্যকর্ম শনাক্ত করে নিবেন। কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়; এ নির্ধারণীর কারণে তাঁর অগণিত কল্যাণসমূহের উত্তরাধিকারী তোমরা হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ কেবল প্রকাশিত দৃশ্যমান মানাসেক হজ্জের অর্থাৎ বাহ্যিক নিয়ম কানুনের নামই নয়, বরং ইসলামে প্রতিটি ইবাদতের আড়ালে ওটার এক রূহ (আত্মা) আছে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত এক তাৎপর্য আছে।

দৃশ্যমান ইবাদত, ইবাদত রূপ দেহের বা বাহিরাবরনের কোমনীয়তা-সজীবতা ইত্যাদি রক্ষা করে। এর আড়ালে রয়েছে এক আত্মা, যে ব্যক্তি আত্মার যত্ন নেয় না আর শুধু দেহেরই যত্ন-আত্তিতে ব্যতিব্যস্ত সে এক মৃতদেহের পরিচর্যাকারী, তার ওই ইবাদতের, যার আত্মার (অন্তর্নিহিত তাৎপর্য) খেয়াল রাখা হয় নি, এর কোনই পুণ্য লাভ হবে না, বরং তার সাথে তার প্রভু-প্রতিপালকের সেই ব্যবহারই হবে যা 'মৃতের পূজারী' এক ব্যক্তির সাথে হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হজ্জ সম্পর্কে বলেন,

> 'প্রকৃত কথা এটা যে, **সালেক** (আধ্যাত্মিক জগতের অভিযাত্রী) -এর শেষ অবস্থান যা মর্যাদার এমন স্তর যে, কামনা বাসনা ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় আর পরম উপাস্যের প্রেমে সে বিভোর হয়ে যাবে। প্রেম ও ভালোবাসা যদি তা সত্যিই হয়, তবে সে স্বীয় জীবন ও নিজ অন্তর পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেয়, আর বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে প্রদক্ষিণ তো ওই উৎসর্গীকরণেরই দৃশ্যমান এক নিদর্শন। এক বায়তুল্লাহ্ যেমন ইহজগতের ভূপৃষ্ঠেই রয়েছে তেমনি উর্ধ্বালোকেও এটি বিদ্যমান। যতক্ষণ সেটার প্রদক্ষিণ করা না হয় এরও প্রদক্ষিণ হয় না। এর (ইহজগতের বায়তুল্লাহ্‌র) প্রদক্ষিণকারীরা সকল পরিধেয় পোশাক খুলে ফেলে, দেহে একটিই মাত্র কাপড় জড়িয়ে রাখে, কিন্তু সেটার (উর্ধ্বালোকের) প্রদক্ষিণকারী সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে খোদার কারণে খোদারই জন্য বিবস্ত্র হয়ে যায়। প্রদক্ষিণ করা– পরম উপাস্যের প্রতি প্রেম ভালোবাসার ঐশীপ্রেম-প্রকাশক এক বাহ্যিক

নিদর্শন। প্রেমিক তাঁর (প্রেমাস্পদের) চারপাশে ঘুর ঘুর করে। এমন যে, তার নিজস্ব ইচ্ছা ও সন্তোষের কিছুই আর বাকী থাকে না। তাঁরই পাদপীঠে সে উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে' (সিরাতুল হাকায়েক, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬)।

অতএব এটাই হলো আধ্যাত্মিক হজ্জ, যতক্ষণ কেউ সেই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ না করে, জাগতিক হজ্জ পালনও গ্রহণীয় হতে পারে না, তাই হজ্জ পালনকারীরা, হজ্জ পালনের নিয়্যতকারীদের এ বৈশিষ্ট্য ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য ইবাদতসমূহ যা রয়েছে সেগুলো তো আমরা করে নিয়েছি আর যেগুলো আধ্যাত্মিক ইবাদত, যেগুলোর উপর আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ক্রিয়াশীল হয়, সে ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই যে তা গৃহীত হলো নাকি হলো না। এ সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদতের পর কোন প্রকারের গর্ব ও অহঙ্কার এবং আমিত্ব ও আত্মম্ভরিতা কেন সৃষ্টি হতে যাবে! এটা হলে তো স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের সাথে দূরত্ব আরও বেশী সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, মহিমাগীতি গাওয়া, এটা সঠিকই বটে, তবে ওটা সেরকমই যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদার প্রিয় বান্দা স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদতে যে মুহূর্তে নিমগ্ন থাকে আর বিনয়াবনত হয়ে কাকুতি মিনতি সহকারে সেজদাপ্রণত হয়ে নিবেদিত অবস্থায় রয়, ওই মুহূর্তে পাছে আবার কেউ তাকে দেখে ফেলে, মজে থাকা সে কালটিতে তার মনে এতটাই লজ্জা অনুভূত হয়, যেভাবে তার লজ্জা অনুভূত হতো জাগতিক সম্পর্কের কোন বিষয়ে এভাবে ডুবে থাকা অবস্থায় বাইরের কেউ দেখে ফেললে।

অতএব এটা, একান্ত প্রেমের কথা অন্যদের কাছে ফাঁস হয়ে পড়ার মত। নিবিড় প্রেমের এ কথা তো বান্দা ও তার প্রভূ-প্রতিপালকের মধ্যকার এক গোপন রহস্য, এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, জগত এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয় কেননা, তিনি ইহজাগতিকতার উর্ধ্বে ও পার্থিবতা থেকে সূক্ষ্মতর, কিন্তু যে জাতি খোদাতাআলাকে ছেড়ে পার্থিবতার সন্নিকটে আসতে চায় আর প্রগতি ও উন্নতি পরিত্যাগ করে **খুলুদ ইলাল আরয** করে থাকে যাতে তাকে দুনিয়ায় মূল্যাবান জ্ঞান করা হয় ও তার প্রশংসা করা হয়, এতে করে সে দুনিয়ার প্রতি তো ঝুঁকে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান থেকে ছিটকে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে আত্মম্ভরিতা থেকে রক্ষা করুন। এবং যেমনটি তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) কে দিয়ে নিজের উম্মতদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন ওই শুভ সংবাদ অনুযায়ী লাখ লাখ পবিত্রাত্মা

যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও এখনও হচ্ছেন আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবেন– ওই পবিত্রাত্মাগণের সাথে আমাদের অন্তর্ভূক্ত করুন এবং অন্তর্ভুক্ত রাখুন। আমরা দুনিয়ার প্রশংসা কুড়াতে চাই না তবে খোদা এমন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করে দিন যে, তিনি আমাদের অন্তরে লালিত কোন নেকী- সৎ কর্ম ও আকাঙ্ক্ষা, সে এক সরিষা বীজের সমানই হোক না কেন, তিনি স্বয়ং তা শনাক্ত করতে শুরু করুন আর ওই সরিষা বীজের সমান সৎকর্ম ও আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে প্রেম ভালোবাসা দিন ও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আল্লাহ্ করুন এমনই হোক।

বিশ্বের জাতিসমূহকে তৌহীদের একই কেন্দ্রে
সমবেত করে
আন্তর্জাতিক একত্ব
প্রতিষ্ঠিত করার
ঐশী প্রতিশ্রুতি

জুমুআর খুৎবা
১৯ মে ১৯৬৭

মসজিদ মুবারাক
রাবওয়া

পবিত্র কাবাগৃহ আদিকালে যেভাবে মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বর্তমানেও তেমনি চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণতার এ যাত্রাকালে খোদার এই পবিত্র গৃহই মনুষ্যত্ব ও মানবতার কেন্দ্র নির্ধারিত হওয়া লক্ষ্য ছিল আর এজন্য নবীগণের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব স্থান রূপে বায়তুল্লাহকেই বেছে নেয়া হয়েছে, যাতে 'মানবতার সকল বৈশিষ্ট্য সমাহারকারী নবী' আর 'সম্মিলিত এক মানবজাতির কিবলা', দুটোরই সমাবেশ একই স্থানে ঘটে।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহে.) একটি আয়াতের অংশবিশেষ তেলাওয়াত করেন–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

ওয়া ইয্ জ্বা'আলনাল্ বায়তা মাছাবাতাল্ লিন্নাসি ওয়া আম্না ওয়াত্তাখিযূ মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুছোয়াল্লান (আল বাকারা : ১২৬)।

অতঃপর হুযূর (রাহে.) বলেন, পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠার ২৩ (তেইশ) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার উল্লেখ আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের এই আয়াতে করেছেন, যা থেকে এক অংশবিশেষ এখনই আমি তেলাওয়াত করেছি। সাতটি উদ্দেশ্যের বিষয়ে ইতোপূর্বে আমি আমার খুতবায় বর্ণনা করেছি, সেই সাথে জ্ঞাত করেছি যে, ওই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবী করীম (স.)-এর আবির্ভাবে কীরূপে অর্জিত হয়েছে।

অষ্টম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, যার উল্লেখ এখানে **মাছাবাতান** বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুনর্নির্মাণের এটি অষ্টম উদ্দেশ্য। এখানে এমন এক রসূল আবির্ভূত হবেন যিনি বিশ্বের সমস্ত জাতিকে **উম্মাতুঁও ওয়াহেদাতুন**-এক উম্মতে পরিণত করে দিবেন আর এমন এক শরীয়ত অবতীর্ণ হবে যার মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত ও উৎকণ্ঠিত জাতিসমূহকে এক তৌহীদের কেন্দ্রে এবং পাক-পবিত্রতার একই কেন্দ্রবিন্দুতে এনে সমবেত করা হবে। এ উদ্দেশ্যও নবী করীম (স.) এর আগমণে সাধিত হয়েছে।

মাছাবাতান-এর আভিধানিক একটি অর্থ **মুজতামাউন্নাসে বাঅ্'দা তাফার্রুকিহীম** (আল কামুসুল মুহীত) দ্বিধা বিভক্ত ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর পুণরায় জনগণ যে স্থানে একত্রিত হয় তাকে 'মাছাবাতুন' বলা হয়।

এর অপর একটি অর্থ হলো **মাকানান ইউক্তাবু ফীহেস্ সাওয়াব** ওই জায়গা, যে স্থানে জনগণের জন্য পুণ্যের বিনিময় বা প্রতিদান ও প্রতিফলের আদেশনামা জারি করা হয় বা আদেশনামা লিখিত হয়। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই বায়তুল্লাহ্কে নবী করীম (স.)-এর আবির্ভাবের পর আমরা এমন এক কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করবো যে, দুনিয়ার দ্বিধাবিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতিগুলো পূণর্বার এখানে একত্রিত হবে। এছাড়া তাদের জন্য ভিন্ন কোন স্থান রইবে না যেখান থেকে তারা তাদের নিজ প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে পুণ্য অর্জনের কোন ধারণা পেতে পারে বা পুণ্য লাভের কোন আশাও পোষণ করতে পারে!

যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি, এ বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ করতেই আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে আবির্ভূত করেছেন ও ইসলামের শরীয়ত বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন, যেভাবে সূচনালগ্নে পবিত্র কাবাগৃহ মানবতার কেন্দ্র ছিল; কেননা হযরত আদম (আ.)-এর যুগে নবী একজনই ছিলেন আর জাতিও একজাতি-ই ছিল ও শরীয়ত বিধিবিধানও একটিই ছিল, সে যুগে মানুষ পৃথিবীতে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়া ছিটিয়ে বসবাস শুরুই করে নি। তাই মানুষ জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্তও ছিল না। অতএব, প্রারম্ভিক যুগে পবিত্র কাবাগৃহই আধ্যাত্মিকভাবে মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। পরবর্তীকালে আদম (আ.)-এর বংশধরেরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ও দূর-দূরান্তের এলাকায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। ফলে, পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ আর টিকে না থাকার কারণে তাদেরকে আত্মিক উন্নতি দান করতে ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিপালন করতে, বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীতেই আল্লাহ্ তা'লা আলাদা আলাদা ভাবে নবী-রসূল প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে আধ্যাত্মিকভাবে তারা আর একই জাতি রইল না বরং পরস্পর দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় মতবিরোধ বেড়ে গিয়ে আদম-বংশধরেরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

তাই আদিকালে যেভাবে পবিত্র কাবাগৃহ মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বর্তমানেও তেমনি চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণতার এ যাত্রাকালে খোদার এ পবিত্র গৃহই মনুষ্যত্ব ও মানবতার কেন্দ্র নির্ধারিত হওয়া লক্ষ্য ছিল আর এজন্য নবীগণের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আবির্ভাব স্থান রূপে বায়তুল্লাহ্‌কেই বেছে নেয়া হয়েছে, যাতে **মানবতার সকল বৈশিষ্ট্য সমাহারকারী নবী** আর **সম্মিলিত এক মানবজাতির কিবলা**, দুটোরই সমাবেশ একই স্থানে ঘটে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ের প্রতি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আ.)-এর দু'টি উদ্ধৃতি, যা এ বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে, তা আমার প্রিয় বন্ধুদের পাঠ করে শুনাচ্ছি।

হুযূর (আ.) বলেন,

> আদিকালে জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। সংখ্যা এতটার চেয়েও কম ছিল, যত সংখ্যক হলে এক জাতি বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে, এ কারণে তাদের জন্য একটি কিতাবই যথেষ্ট ছিল। এরপর জনগণ যখন দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল আর ভূ-পৃষ্ঠের একেক অংশের বসবাসকারীরা একেকটি জাতিতে পরিণত হয়ে গেল, দুর-দূরান্তে ভ্রমণের কষ্টসাধ্য প্রতিকূলতা এতটা প্রকট হয়ে দেখা দিল যে, এক

জাতি অন্য জাতির হাল-অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরী বেখবর, অনবহিত ও অজ্ঞ হয়ে পড়লো, এমন যুগে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতা এ প্রয়োজন নির্ধারণ করে যে, প্রত্যেক জাতিতে পৃথক পৃথক রসূল ও ঐশী কিতাব দেয়া যাক। অতএব, তদ্রূপই হলো। পরবর্তীকালে মানবজাতি যখন চাষাবাদ পদ্ধতিতে উন্নতি সাধন করল ও জনসংখ্যা আরও বেড়ে গেল এবং পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের পথ খুলে গেল, এক দেশের মানুষের সাথে অন্য দেশের মানুষের যোগাযোগের উপায় ও উপকরণ হাতের নাগালে এসে গেল, আবার এ তথ্যও জানা হয়ে গেল যে, ভূ-পৃষ্ঠের ওমুক ওমুক অংশে মানব জাতি-গোষ্ঠী বসবাস করে চলছে। এ অবস্থায় পদার্পণের পর খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো, এদের সবাইকে পুনরায় দ্বিতীয়বারের মত এক জাতিতে পরিণত করে দেয়া। সুতরাং খোদাতাআলা সকল দেশ ও জাতির জন্য এক কিতাব প্রেরণ করলেন আর ওই কিতাবে আদেশ প্রদান করা হলো যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে এ কিতাব বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে যখন পৌঁছাবে, তাদের বাধ্যবাধকতা থাকবে যে তারা যেন তা মান্য করে গ্রহণ করে নেয় আর এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। হ্যাঁ, সেই কিতাব হলো পবিত্র কুরআন, যা সকল দেশের মধ্যে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেরীত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের পূর্বের সকল কিতাব অনন্যরূপে সুনির্দিষ্ট একজাতির জন্য বিশেষায়িত ছিল অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি জাতির জন্যই প্রেরীত হতো,... কিন্তু সবার পর পবিত্র কুরআন করীম অবতীর্ণ হলো, যা এক বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন কিতাব এবং কোন বিশেষ জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানবকূলের জন্য। অনুরূপভাবে, কুরআন শরীফ এমন উম্মতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ধীরে ধীরে একই জাতিতে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতো। অতএব যুগের অবস্থানুযায়ী এখন, এমন উপকরণের যোগান এসে গেছে যা বিভিন্ন জাতিকে 'একত্বে'র অদ্বিতীয় রূপ দিতে যাচ্ছে। পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ ও মেলামেশা যা একজাতিতে পরিণত হওয়ার মূল নিয়ামক– এতই সহজ ও আয়েশসাধ্য হয়েছে যে, বছর ধরে যে পথ সফর করতে হতো, তা মাত্র কয়েকদিনেই সম্পন্ন হতে পারে আর সংবাদ প্রেরণ ধারায় এমন সব পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে যে, সূদূরের দেশ থেকে যে বার্তা এক বছরের মধ্যেও আসা সম্ভব ছিল না, তা এখন মুহূর্তের মধ্যেই এসে যেতে পারে। যুগের মাঝে এমন এক মহা-বিপ্লব

সংঘটিত হয়ে চলছে। আর সংস্কৃতির স্রোতধারা এমন একদিকে মোড় নিয়েছে যা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, এ যুগে খোদা তা'লার এটাই ইচ্ছা, সকল জাতি যারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের এক জাতিতে পরিণত করা আর হাজার হাজার বছর ধরে নিখোঁজ ও বিস্মৃতদের একত্রে মিলিয়ে দেয়া (চশমায়ে মা'রেফাত, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৯)।

এমনিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অপর এক স্থানে বলেন,

যেহেতু আঁ-হযরত (স.)-এর নবুওয়্যত কাল কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত এবং তিনি (স.) হলেন খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। এজন্য খোদা এটা চাননি যে, জাতিসমূহকে একত্বের রূপ দেয়াটা আঁ-হযরত (স.)-এর জীবদ্দশাতেই পূর্ণতায় পৌঁছে যাক। কেননা, এ অবস্থা ঘটলে, তাঁর (স.) যুগের পরিসমাপ্তি সাব্যস্ত হয়ে যেতো, অর্থাৎ তাঁর যুগ সে পর্যন্তই পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে বলে সন্দেহের উদ্রেক হতো। যদিও, চূড়ান্ত যে কর্ম তাঁর (স.) সাধন করার ছিল, তা সে যুগেই পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, তবুও খোদা তাআলাই ওই কর্মটি– যাতে সকল জাতি এক জাতির ন্যায় পরিণত হয়ে যাবে আর একই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা মুহাম্মদীয় যুগের শেষ অংশে সোপর্দ করেন, যা হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগ। তাই, সেই চূড়ান্ত কর্মের পূর্ণতা দান করতে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের মধ্য থেকে একজন স্থলাভিষিক্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি **মসীহ্ মাওউদ** নামে আখ্যায়িত হয়েছেন আর তারই নাম **খাতামাল খোলাফা**ও রাখা হয়েছে। এভাবে মুহাম্মদীয় যুগের শীর্ষে রয়েছেন আঁ-হযরত (স.) আর শেষে হলেন মসীহ্ মাওউদ। আর এটা অবধারিত ছিল, দুনিয়ায় এ সিলসিলা যেন কর্তিত না হয়, ধ্বংস না হয়, যত দিন না তিনি জন্মলাভ করেন। কেননা **জাতিসমূহকে একত্রিত করার সেবা কর্মটি** ওই নবুওয়তের প্রতিনিধির জিম্মাতে ও দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়েছে।

আর সেদিকেই এ আয়াত ইঙ্গিত করছে। আয়াতটি হলো,

هُوَ الَّذِيٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ

হুওয়াল্লাজি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউয্‌হিরাহু আলাদ্ দীনি কুল্লিহী (সূরাতুস্ সাফ : আয়াত ১০)।

অর্থাৎ তিনি স্বয়ং খোদা যিঁনি নিজ রসূলকে এক পরিপূর্ণ হেদায়াত (পথ-নির্দেশনা) ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যা একে (সত্য ধর্মকে) সর্বপ্রকার ধর্মের উপর বিজয়ী করে দেয়। অর্থাৎ একে সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত করে দেয় এবং যেহেতু আঁ হযরত (স.)-এর জীবদ্দশাকালের ঐ বিশ্ববিজয় বর্তমান যুগের ন্যায় প্রযুক্ত ও দৃশ্যমান ছিল না, আর তা সম্ভবও ছিল না যে খোদা প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনরূপ স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হতে পারে, এ জন্যই এ আয়াতের ব্যাপারে সকল প্রাচীন ধর্মপরায়ণ পূর্বসূরীগণ, যারা আমাদের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই বিশ্ববিজয় **মসীহ্ মাওউদ (আ.)**-এর যুগে প্রকাশিত হবে। কেননা 'ওই বিশ্ববিজয়' এর জন্য তিনটি সুযোগ বা কর্মপদ্ধতি বা নীতি কার্যকর হওয়া আবশ্যক যা পূর্ববর্তী কোন যুগেই পরিলক্ষিত হয় নি।

প্রথমত পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও মেলামেশা করার সহজ ও আয়েশসাধ্য পথ খুলে যাওয়া। ভ্রমণের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট, বাধা বিঘ্ন ও ক্লান্তি বিদূরীত হওয়া...

দ্বিতীয় সুযোগ বা উপায়, যা এ কথা বুঝবার জন্য জরুরী তা হলো, কোন একটি ধর্মকে নিজ ধর্মের সৌন্দর্য ও গুণাবলীর মাপকাঠিতে অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত হতে হবে।

এটা হলো সেই পদ্ধতি যা অবলম্বন করলে পৃথিবীর সব জাতি, নির্দ্বিধায়, আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম বিষয়ে পারস্পরিক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী অন্য ধর্মাবলম্বী জাতির কাছে উপস্থাপন করতে পারে, এভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং সঙ্গতি ও অসঙ্গতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্য ধর্মের অপূর্ণতাকে তুলে ধরতে পারে। এভাবে নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য ও মাধুর্যপূর্ণ শক্তি পরীক্ষার জন্য পৃথিবীর সকল জাতিই এ সুযোগ পেতে পারে। তারা একই স্থানে সমবেত হয়ে একে অন্যের সাথে ধর্মীয় তর্কযুদ্ধের অবতারণা করুক... আর ধর্মীয় শক্তির এ পরীক্ষা কেবল একটি দু'টি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং বিশ্বব্যাপী হউক...।

> সমগ্র বিশ্বে প্রাধান্য সাব্যস্ত করতে হলে **তৃতীয় পন্থা** বা উপায় যার শর্ত হলো এরূপ যে, প্রমাণিত হতে হবে দুনিয়ার সকল ধর্মের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ওমুক ধর্মটি খোদার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাহায্যপুষ্ট... আর তা এভাবে প্রমাণিত হবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য সব জাতির চেয়ে ঐশী সাহায্য ও ঐশী নিদর্শন ওই জাতির সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, অনুরূপ অবস্থা অপর কোন ধর্মে পরিলক্ষিতই হয় না, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোন ধর্মই ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে তাদের সাথে মোকাবেলা করতে সমর্থ নয়, এতদসত্ত্বেও যে, দুনিয়ার কোন একটি জনগোষ্ঠীকেও প্রতিযোগিতামূলক এই আহ্বান জ্ঞাত করায় বাদ রাখা হয়নি (চশমায়ে মারেফাত, পৃষ্ঠা ৮২ থেকে ৮৬)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আজকাল পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেছে যে সমগ্র দুনিয়ার ধর্ম ভিত্তিক সম্প্রদায়গুলোর নিজ নিজ ধর্মের 'আধ্যাত্মিক শক্তি' ময়দানে পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। সকল জাতি নিজ নিজ প্রতিনিধিদেরকে এক স্থানে সমবেত করে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধর্মের ময়দানে সব সম্প্রদায়কে যদিও আহ্বান করেছেন, তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা হযরত রসূল করীম (স.)-এর যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। গত জলসা সালানা অনুষ্ঠানকালে বিভিন্ন সমস্যা ও সঙ্কটের মীমাংসা প্রদানকারী আহ্বান, আমি জগত সমক্ষে উপস্থাপন করেছি। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা ইউরোপ সফরের সুযোগ ও সামর্থ্য দান করলে ইচ্ছা রাখি, সেখানকার রাষ্ট্রগুলোতে যারা খ্রীষ্টান দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে, মীমাংসাকারী ওই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করব ও শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক পুণর্মিলনে ইসলামের সমুজ্জল শিক্ষা ও নীতিমালার মোকাবেলা করতে তাদের আহবান জানাবো, নিজেদের সত্যতা (যদি তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস যথার্থই সত্য বলে জানে) সাব্যস্ত করুক, এর বিপরীতে আমি স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি গভীর আস্থা রাখি যে, যদি তারা সিদ্ধান্ত লাভের এ ময়দানে, মীমাংসা হয়ে যাবার এ মাঠে আসে, তবে আল্লাহ্ তা'লা এমন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করে দিবেন যে, জগৎসমক্ষে তারা নিজেদের **'হার মানা হার'**কে মেনে নিতে বাধ্য হবে, ইনশাআল্লাহ্তাআলা! তাহলে **অষ্টম উদ্দেশ্য** হলো সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহকে একত্বের শৃংখলে গ্রথিত করা, আর নবী করীম (স.)-এর মাধ্যমে এই পরিকল্পনা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছেন যে, এ উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়াটা আহমদীয়া জামা'তের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ কারণে আহমদীয়া জামা'তের উপর গুরুত্বপূর্ণ মহান এক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, যে বিষয়ের প্রতি আমার ও আপনাদের– সকলের মনোযোগ দিতে হবে।

অতএব অষ্টম উদ্দেশ্য **মাছাবাতান**-এ বর্ণিত হয়েছে ও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যতিরেকে অন্য কারও মাধ্যমে অর্জিত হয় নি। আর তা অন্য কারও মাধ্যমে লাভ করা সম্ভবও নয়। কেননা অপর কোন নবীদের এমন শরীয়ত দেয়া হয় নি কারণ পূর্বের সেই নবীগণের জাতিরা বিশেষায়িত জাতি ছিল আর তাদের সম্পর্ক ও দায় কেবল নিজ নিজ জাতির প্রতি ও নিজ নিজ যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র মুহাম্মদ (স.)-এর সত্ত্বা, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যিনি এমন এক শরীয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন, যা মানুষের যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূর্ণকারী আর যার সম্পর্ক হলো পৃথিবীর প্রতিটি জাতির সাথে ও কিয়ামত কাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত প্রতিটি যুগের সাথে। যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (স.)কে প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক সময়ে নির্ধারিত ভাবে পূর্ণ হয়ে চলছে। এই যে প্রতিশ্রুতি, যেটি বলা হলো, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটা পূর্ণতা লাভের সময় হলো মসীহ্ মাওউদ-এর যুগ আর তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব হলো আহমদীয়া জামা'তের উপর। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এ মহান দায়িত্ব পালনের তৌফিক (সামর্থ্য) দান করুন।

নবম উদ্দেশ্য– যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে তা **আমনান** বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে। 'মাছাবাতান' এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক টেকসই ভিতের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থায়ী করতে এটা জরুরী যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখা, জাতিসমূহের পারস্পরিক আস্থাপূর্ণ সম্পর্কের মাঝে শান্তি ও সন্তোষ বিরাজমান রাখার অবস্থা সৃষ্টি করা আর এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। প্রতিশ্রুতি এটা দেয়া হয়েছিল যে, 'মাছাবাতান' এর অঙ্গীকার পূর্ণ হবে ও তার জন্য আবশ্যকীয় যে বিষয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করা, সেই প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মাধ্যমে দুনিয়ায় যে শরীয়ত প্রবর্তিত হবে তাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা প্রদান করা হবে আর আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা শুধু মাত্র প্রদত্ত এই শিক্ষার উপর

আমল করেই লাভ করা যেতে পারে, যে শিক্ষা মক্কা থেকে আগমনকারী খাতামান্নাবীঈন (স.) জগতসমক্ষে উপস্থাপন করবেন, কেননা সর্বশেষ এই শরীয়তের বিধি-বিধানে প্রকৃতিগত যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার এবং স্বভাবজাত সব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু ও সঠিক পরিচর্যার উপকরণাদি রাখা হবে আর মানবীয় বোধ ও চেতনা ওই পথ-নির্দেশনা পর্যবেক্ষণ করে আশ্বস্ত হবে ও তার অন্তর স্বস্তি লাভ করবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুরআন করীমে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা খুবই বিশ্লেষণধর্মী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন আমি তার সার্বিক বর্ণনায় যেতে চাচ্ছিনা। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযি.)-এর পুস্তক **আহমদীয়াত ইয়ানী হাক্বীকি ইসলাম** (আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম) ও **নেযামে নও** (নব বিধান অর্থাৎ নূতন বিশ্বব্যবস্থা)– এ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। ওই পুস্তক দু'টিতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযি.) এ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি নীতিগত ও মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ কুরআন করীমে পাওয়া যায়। যতদিন পৃথিবীতে ওই নীতিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন করা না হবে জগতের আন্তর্জাতিক কোন সংগঠনই সফলতা লাভ করবে না। অতীতে **লীগ অব ন্যাশনস্** অকৃতকার্য ও নিষ্ফল হয়েছে পরবর্তীতে যেমনটি আজকাল আমরা দেখছি **U.N.O.** (জাতিসংঘ) অকৃতকার্য ও নিষ্ফল হতে যাচ্ছে, এর বড় কারণ বরং একমাত্র কারণই যা বলা যায় তা হলো, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি-সম্প্রীতি, সমতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন করীম যে শিক্ষা দিয়েছে, এসব লোকেরা তার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না ও মনোযোগীও হচ্ছে না বরং মানছেই না। ওই নীতিগুলো অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করার পরিণামে তারা প্রতিনিয়ত অকৃতকার্য ও নিষ্ফলতার মুখ দেখে চলছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাযি.) তাঁর নিজ পুস্তকসমূহে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন যে, পারস্পরিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কেবল কুরআন করীমে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিবর্তে বিশ্ব একই সময়ে একই সাথে দ্বিমুখী নীতি আরোপিত 'চুক্তি' সম্পাদন করছে। সকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সাধারণ এক সম্পর্ক রয়েছে আবার শক্তিধর বড় বড় রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বিশেষ এক সম্পর্ক স্থাপন করে নিচ্ছে। এভাবে যেহেতু তারা দুই নৌকায় পা রাখছে, এ কারণে তা (বিশ্বশান্তি) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে U.N.O. (জাতিসংঘ) নিজেদের জন্য সাধারণ যে নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছে এরই অভ্যন্তরে ভিন্ন এক নীতি ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এক চুক্তিবিশেষ ছাড়া এটা ভিন্ন কিছু কী! এতদসত্ত্বেও তারা এর মধ্যে **ভেটো**

ক্ষমতাকে কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, অর্থাৎ কতক শক্তিধর রাষ্ট্রকে তথা নিরাপত্তা পরিষদকে U.N.O. এই প্রাধান্য দিয়েছে যে, তাদের সমর্থন ও সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন বিষয় বা সমস্যা-সংকট নিষ্পত্তি হতে পারবে না। প্রকৃত নীতি যদিও সেরকমই, যে ভাবে কোন আইন একজন নাগরিকের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। আইনে 'ধনী ও দরিদ্র', 'শক্তিশালী ও দুর্বল'–এর মধ্যে বৈষম্য করা হয় না, আর তা করা উচিতও নয়, যদি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তদ্রূপ এটা জরুরী, আন্তর্জাতিক নীতিমালায় বা আইনে কোন রাষ্ট্রকে অপর যেন কোন রাষ্ট্রের ওপর প্রাধান্য দেয়া না হয়। যদি প্রাধান্য দেয়াই হয় তবে ওই আন্তর্জাতিক আইন অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কুরআন করীমই এ শিক্ষা দেয় যে, এক জাতিকে অপর জাতির উপর প্রাধান্য দিওনা। তারা ভেবেছে– আমরা বড়ই শক্তিশালী জাতি, জোর করে আমরা যা চাই, তা-ই করতে পারি। এ কারণে **ভেটো** প্রয়োগের অধিকার কতক রাষ্ট্রকে (নিরাপত্তা পরিষদকে) দিয়ে দেয়া হয়েছে বা তারা সে ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে। আর বর্তমানে U.N.O. এর বিফলতার বড় কারণ এটাই যে, তারা চুক্তিবদ্ধ কালে কেবল এক রকমের শর্ত নির্ধারণ করেনি যাতে করে সকল জাতিসত্তা একই আন্তর্জাতিকতার নিরিখে মর্যাদা পায় বরং এর অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক এক শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, যা গুটি কয়েক জাতির সাথে সম্পর্কিত, বিশ্বের সকল জাতির সাথে এর সম্পৃক্ততা নেই। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কুরআন করীম দ্বিতীয় এই পথ-নির্দেশনা দিয়েছে যে, যখনই বিরোধ দেখা দিবে সে সময়ই তা নিষ্পত্তি করতে উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু আজকাল নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের প্রতি দৃষ্টি রেখে এটা নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, তারা (বড় ক্ষমতাধর রাষ্ট্র) বিবাদ-বিসম্বাদকে দীর্ঘায়িত করে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তা চলতে দিতে থাকে, যাতে নিজেদের কিছু স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়া যায়। এভাবে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অতঃপর তৃতীয় দিকনির্দেশনা এই ছিল যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ফোরাম গঠন ক্ষতিকর বরং আত্মঘাতী, কিন্তু আন্তর্জাতিক নীতিমালায়, যা U.N.O. রূপে জগতসমক্ষে বিদ্যমান, এর উপস্থিতি সত্ত্বেও তা করা হচ্ছে। আবার ওই বড় বড় রাষ্ট্রগুলো, অন্যান্য রাষ্ট্র যারা এর সদস্য নয় বরং বৈরী, তাদের সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি করা শুরু করে দিয়েছে এবং যে রাষ্ট্রগুলোর সাথে ওদের একান্ত ও নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে তাদের পক্ষে ওকালতি ও খবরদারী করার পন্থাও অবলম্বন করতে শুরু করেছে।

অতএব, পবিত্র কুরআন করীম-ই নির্দেশ করেছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি কেবল এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে যখন জাতিতে জাতিতে বৈষম্যমূলক আচরন না করা হবে এবং কোন জাতি অপর জাতির উপর অবৈধ আগ্রাসনের পাখনা বিস্তার না করবে।

চতুর্থ শিক্ষণীয় বিষয়– যার বিরোধী হলো পবিত্র কুরআন, কিন্তু পক্ষে হয়ে গেছে এই যালেম (নির্যাতনকারী) দুনিয়া, তা হলো ঝগড়া বিবাদ হয়ে গেলে স্থায়ীভাবে নিষ্পত্তি করার পরিবর্তে তারা কোন কোন জাতিকে শাস্তি প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে, আর যখন যেখানেই এ সুযোগ পায়, সেই দেশ বা রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্ন অংশে টুকরো টুকরো করে নিজেরা বখরা বসায়। জার্মানীকে (দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দায় জার্মানীর উপর চাপিয়ে দিয়ে) শাস্তিস্বরূপ দু'টুকরো করে দেয়া হয়, কোরিয়া ও ভিয়েতনামেরও একই হাল করা হয় U.N.O. বহাল থাকা সত্ত্বেও, যখন কী-না U.N.O. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকারী সংগঠন বলে একচ্ছত্রভাবে দাবী করে চলছে।

কুরআন করীম বলে, আমার ছায়াতলে চললে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। আমার ছায়াঘেরা সীমানার বাইরে বের হলেই শয়তানী মরীচিকার ধোঁয়াশা ও তাপদাহ তোমাদের গ্রাস করবে ও স্বস্তি পেতে দেবে না।

কুরআন করীম পঞ্চম শিক্ষা দিয়েছে এই যে, যদি বিশ্বে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই হয় তবে সব রাষ্ট্রকে, সকল জাতিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এখন তো অবস্থা হলো, কিছু রাষ্ট্র ক্ষতি স্বীকার করছে আর অপর কতক রাষ্ট্র আত্মত্যাগ করা অস্বীকার করে চলেছে। তাই কেবল কুরআন করীমেই এমন শিক্ষা রয়েছে, যার উপর আমল করে জগতে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাযি.) স্বীয় পুস্তক 'আহমদীয়াত ইয়ানী হাক্বীকি ইসলাম' (আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম, বক্তব্য প্রকাশ কাল-১৯২৪)-এ এসব বিতর্কের অবসানে উপসংহার টানেন যে–

> এ পাঁচটি অপূর্ণতাকে দূর করা গেলে কুরআন করীমে বর্ণিত **লীগ অব ন্যাশনস্** গঠিত হতে পারে আর তেমন লীগ(সংগঠন)ই প্রকৃতভাবে কোন উপকারে আসতে পারে, ওইরূপ লীগ নয় যা নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে অন্যের কৃপাপূর্ণ দৃষ্টির মুখাপেক্ষী আর অপরের অধিকার ক্ষুন্নকারী (আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকি ইসলাম, পৃষ্ঠা-২৩)।

এছাড়াও তিনি (রাযি.) **নেযামে নও** (নব বিশ্ব ব্যবস্থা, বক্তব্য প্রকাশকাল ১৯৪২) পুস্তকে বলেন, এই লীগ অব ন্যাশনস্ কখনই সফল হতে পারে না। কেবল সে লীগই সফল হতে পারে, যেটি কুরআন শরীফ নির্দেশিত হেদায়াত অনুযায়ী গঠিত (নেযামে নও, পৃষ্ঠা-৭৬)।

আমি যেমনটি বলেছি– আল্লাহ্ তাআলা এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বা পরিকল্পনা করেছেন যে, বিশ্বের সকল জাতিকে এক সিলসিলায় গ্রথিত করে নেয়া হবে, আন্তর্জাতিক একত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে। অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দাবী করেন, আন্তর্জাতিক একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি বিরাজমান থাকা জরুরী, কুরআন করীমের শরীয়তে বর্ণিত নীতিমালা সেই নিশ্চয়তা বিধান করে। এই শরীয়তের আদেশাবলীর উপর আমল করলে, দুনিয়ার জাতিসমুহের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যদি হয়েও যায় তবে ন্যায় বিচার ও সমতার নীতিমালা কার্যকর করা হলে, তা নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। কুরআন করীম বিশদভাবে এমন শিক্ষাই দান করেছে, যার ফলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেহেতু **মাছাবাতান** এর উদ্দেশ্য অর্জন করার দায়িত্ব আহমদীয়া জামা'তের উপর ন্যস্ত, এ কারণে এ দায়িত্বটিও আহমদীয়া জামা'তেরই। সেই মহান শিক্ষা ব্যাপকভাবে তারা প্রচার করুক যা কুরআন করীম পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের নির্দেশ করেছে, কেননা জগত যদি এ নির্দেশনার বিষয়ে আঁধারে থেকে যায়, তবে কিয়ামত দিবসে বলতে পারবে যে, 'হে খোদা! আমাদের তো জানা ছিল না, যাদের জানা ছিল আর যাদের কাঁধে তুমি এ দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলে যে তারা আমাদের এটা জানাবে, তারাও আমাদের এ বিষয় জ্ঞাত করেনি, এজন্য আমাদের নির্দোষ সাব্যস্ত করো আর যারা অপরাধী-দোষী তাদের উপর স্বীয় ক্রোধ নিপতিত করো', আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

বায়তুল্লাহ্ র্নিমানের দশম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে **ওযাত্তাখিযু মিম্ মাকামি ইব্রাহীমা মুছোয়াল্লা**– যাতে বলা হয়েছে, এই মক্কা থেকে বায়তুল্লাহর মাধ্যমে ও এখানে আবির্ভূত হওয়া মহানুভব মহীয়ান নবীর কল্যাণে জগতের জাতিসমূহ **উবুদীয়তের** (সৃষ্টিতত্ত্বের ও দাসত্বের) নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করবে এবং সেই প্রকৃত ইবাদত (উপাসনা)-এর ভিত্তি এখানেই স্থাপিত হবে, যেথায় বিনয় ও বিলীনতা প্রতিবিম্বিত হয়ে বিকশিত হয়। আর এভাবে জাতিতে জাতিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'-এর যিল্ল

(প্রতিবিম্ব বা ছাপ) সৃষ্টি হয়ে যাবে। পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র নির্মিত হতে থাকবে, যেখানে বিনীত ও বিনম্র দোয়া যাচনা করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার মহান ও বিশাল মর্যাদা ও প্রতাপ ঘোষিত ও বিকশিত হতে থাকবে। ওই বিনম্রতা যা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেবল খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হবে, তার প্রতিফলে সেই জাতিসমূহ ঐশী কল্যাণ লাভ করবে আর ক্ষমা ও মার্জনা পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে।

আরও বলা হয়েছে যে, এখানে– এই মক্কায় ওই শরীয়তের কল্যাণে যা এখানে অবতীর্ণ হবে, তা হলো **নামায**– নামাযের সকল অর্থ ও এর প্রতিটি শর্ত সহকারে আদায়কারী এক উম্মত এখানে সৃষ্টি হয়ে যাবে, যারা **উবুদিয়ত** (দাসত্ব)-এর মর্যাদায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী দুই উদ্দেশ্যের সাথে এরও সম্পর্ক রয়েছে। কেননা অষ্টম প্রতিশ্রুতি ছিল, সকল জাতিকে এক 'উম্মতে মুসলেমা'য় পরিণত করে দেয়া হবে, উদ্ভব ঘটানো হবে এক-ই জাতির, এমনটি হতেই পারে না, যতক্ষণ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে। পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অতঃপর ওই প্রতিশ্রুতি কুরআন করীমের শরীয়তের নীতিমালার আদলে পূর্ণ করেছেন, যাতে সেই পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা, যা বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী, তা মানবজাতিকে প্রদান করা হয়েছে।

দশম উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা জানাচ্ছেন যে, এ শিক্ষা কার্যকর হতে পারে না যতক্ষণ উম্মতে মুসলেমা তথা প্রতিশ্রুত উম্মত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্যকারী ও বিনয় অবলম্বনকারী না হচ্ছে। এ কারণে তিঁনি (আল্লাহ্) বলেন **ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুছোয়াল্লা** ছাড়া তোমরা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এখানে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে নবী আকরাম (স.)-এর মাধ্যমে এমন এক উম্মত সৃষ্টি করা হবে যারা **মাকামে উবুদীয়ত** (দাসত্ব)-এর মর্যাদায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

> "কুরআন করীমের পরিপূর্ণ মান্যকারী যে ব্যক্তি স্বীয় দাসত্বের মর্যাদাকে শনাক্ত করতে পেরেছে ও এতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে এমন যে– আল্লাহ্ তা'লার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব, মহানুভবতা ও উদারতায় সর্বদা গভীরভাবে নিমগ্ন থেকে নিজের প্রকৃত তাৎপর্য–অবমানিত অনস্তিত্ব, শূন্যতা ও অক্ষমতা জেনে যায়, স্বীয় রিক্ত নিঃস্ব ও সহায় সম্বলহীন অবস্থা এবং ভুলত্রুটি উপলব্ধি করে নিজেকে অপরাধী ভাবে আর তুচ্ছ সব গুণ যা তাকে প্রদান করা হয়েছে,

সেটাকে আকস্মিক ওই সূর্য-কিরণ ও রশ্মির মত মনে করে, যা আচমকা কোন মুহূর্তে সূর্য থেকে দেয়ালে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থাৎ আলোকরশ্মির ওই দেয়ালের সাথে কোনই যোগসূত্র বা সম্পর্ক নেই, এ হলো মেকী সাজ-সজ্জার মত, ব্যর্থ প্রয়াসের অনুরূপ। অতএব, যাবতীয় সদগুণসমূহ খোদাতেই পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে এবং সকল পুণ্যকর্মের উৎস তাঁর পরিপূর্ণ ও পূর্ণ সত্তাতেই বিদ্যমান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা ও পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ গুণাবলী অর্জনের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির এ পথ-যাত্রায় তাদের অন্তর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে **(হাক্কুল ইয়াক্বিন)** প্রাচুর্যতা লাভ করতে থাকে, উপলব্ধি করে নেয়– আমরা কোন কিছুই নই। এতটা তুচ্ছ যে স্বীয় অস্তিত্ব, নিজস্ব ইচ্ছা বা অভিলাষ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে, আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্বের উত্তাল সমুদ্র তার অন্তর এমনভাবে ছেয়ে নেয় যে হাজারো রকমের অস্তিত্ববান অনস্তিত্বে পতিত হয়ে তাঁর মাঝে বিলীন হতে থাকে, এভাবে সে সুপ্ত ও গুপ্ত শির্ক এর প্রতিটি রন্ধ্র থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে পাক-পবিত্র হয়ে যায়" (বরাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অপর এক স্থানে বলেন,

"নামায আদায় পদ্ধতি, এর নিজের মাঝে শিষ্টাচার নম্রতা সকাতর অনুনয় বিনয় ও অক্ষমতার প্রকাশাদি ধারন করে আছে। **কিয়াম** কালে নামাযী হাত গুটিয়ে বা হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে যেভাবে এক চাকর তার মনিবের সামনে বা দাস তার বাদশাহ্র সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। **রুকু** প্রদানের সময় মানুষ অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করতে অবনত হয়ে যায়। সর্বাধিক বিনয় প্রকাশ পায় **সেজদারত** অবস্থায়, যা অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির চরম অবস্থা প্রকাশ করে।" (মির আতুল হাকায়েক ৪র্থ খন্ড, সংকলিত ফতওয়ায়ে আহমদ, প্রকাশকাল ১৩২৫ হিজরী সন, প্রকাশক মৌ. মুহাম্মদ ফযল সাহেব চেঙ্গুয়ী, পৃষ্ঠা-১৫)।

আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, আমি নিজ অনুগ্রহে নবী করীম (স.)-এর মান্যকারীদের মধ্যে এমন এক জামা'ত সৃষ্টি করতে থাকবো , যারা বিনয়ী ও বিনম্র এবং সহানুভুতিশীল অতিথিবৎসল অবস্থানকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে রাখবে আর ওই অনুনয়-বিনয়ের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি প্রতিষ্ঠার

সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দিবেন। **আমনান** বাক্যাংশে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের প্রকৃত শিক্ষা কুরআন করীমই বিশদভাবে আমাদের প্রদান করেছে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃত ইবাদত (১) ভালোবাসা ও আত্মদান, (২) অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি মিনতি– উল্লেখিত প্রতি জোড়া শব্দের নির্যাস দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কখনও প্রেম উদগত হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আবার কখনওবা লাঞ্ছনা সয়ে আত্মবিলীনতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যখন খোদা তা'লার সৌন্দর্য ও তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় তখন মানুষের অন্তর নিজ প্রভু-প্রতিপালকের ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরে ওঠে ও এক আত্মনিবেদিত একনিষ্ঠ প্রেমিকের মত তাঁর প্রতিটি কথায় 'উপস্থিত' (**লাব্বায়েক**) বলতে থাকে। সে তাঁর চারদিকে ঘুর-ঘূর করতে থাকে। সে অনস্তিত্বের পোশাক পরিধান করে তাঁরই মাঝে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে স্বীয় সত্ত্বার উপর পুরোপুরিভাবে মৃত্যুর এক পর্দা উন্মিলিত হলে পর তার প্রভুর পক্ষ থেকে তাকে এক নবজীবন দান করা হয়। কিন্তু জগৎ তা শনাক্ত করতে না পারলেও সে এর কোন ধার ধারে না।

তবে খোদা তা'লার মহা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপের জ্যোতি যখন তার মাঝে বিকশিত হয়ে দৃশ্যমান হয় তখন ভয়ে ও শঙ্কায় তার বুদ্ধি ও চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনায় বিপত্তি দেখা দিয়ে তা লোপ পেতে বসে। আল্লাহ্ তা'লার এ বিশালত্ব ও প্রতাপের এই জ্যোতির্ময় বিকাশ দর্শনের পর তার নিজ সত্তায় কোন সম্মান বা মর্যাদার রেশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে না, বিলীনতার অদৃশ্য এক পোশাক সে পরে নেয়– অক্ষমতা, অনুনয় বিনয়, শিষ্টতা ও বিনম্রতাকে অভ্যাসে পরিণত করে এবং লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সয়ে ধূলি-ধূসরিত হয়ে ধূলিকণার মত দৃষ্টিগোচর হয়। সে বিনয়ের পথ অবলম্বন করে, সেই সাথে শঙ্কিত কম্পমান ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয় নিয়ে স্বীয় প্রভু প্রতিপালকের সমীপে বিনয়াবনত হয় এবং তাঁর মহিমা ও প্রতাপের অঙ্গীকারপূর্ণ ঘোষণা প্রদান করতে থাকে। তার দেহের প্রতিটি কণা ও আত্মার প্রতিটি অবস্থা স্বীয় প্রভুর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর মহিমা ও প্রতাপের এই জ্যোতির্ময় বিকাশ তাকে এমন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান (**হাক্কুল ইয়াকীন**) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয় যে, এর বিপরীতে সৃষ্ট সবকিছু 'মৃত লাশ' বিশেষে পরিণত হয় এবং ভাল কিছু পাওয়ার আশায় এদের উপর নির্ভর করা যায় না আর এরা নিজ সত্তায় সে শক্তি ও ক্ষমতা ধারনও করে না, নির্ভর করা যদি যেতে পারে তবে তিঁনি হলেন, কেবল **যুল জালাল ওয়াল ইকরাম,** আর ভয় ও শঙ্কার সাথে এক আশা ও ভরসা ও নির্ভরশীলতাও তার অন্তরের পবিত্রতার মাঝে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সে তার যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বীয় প্রভু প্রতিপালকের মাঝেই

অন্বেষণ করে ও কেবল তাঁরই উপর নির্ভর করে আশা-ভরসা ও আস্থা রাখে, প্রয়োজনকালে কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর দুয়ারে কড়া নাড়ায়। তার অন্তর এ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে যে, যা কিছু পাবার কেবল এ দরজা পথেই পাওয়া যাবে– জুতার ফিতাই হোক বা জগত-সংসারের মান-সম্মানই হোক!

যে ব্যক্তির উপর মহিমা ও প্রতাপের এ জ্যোতির্ময় বিকাশ প্রকাশিত হয়, সে এটা করে না যে কাশ্‌ফ (সত্যস্বপ্ন) ও রুইয়া (দিব্যদৃষ্টি)-এর এক থলে নির্মাণ করে, দোয়া কবুল (গৃহীত) হওয়ার বর্ণনা ও ঘটনার দ্বারা সেটাকে সাজিয়ে, দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকবে এবং পৃথিবীবাসীদের কাছে পার্থিব সম্মান ও ভক্তি, গুণ-কীর্তন ও প্রশংসা ভিক্ষে করে ফিরবে আর দুনিয়ার কাছে ভক্তি-শ্রদ্ধা পেতে লালায়িত হবে। এক মৃতের, এর (পৃথিবী) কাছ থেকে কী নেবার আছে! আর এক লাশের তাকে দেবার-ই বা কী আছে! যাঁর মহিমা ও প্রতাপের ভয়, যাঁর অপরিসীম রহমত (কৃপা)-লাভের আশা, তাকে যে দ্বারের ফকীর বানিয়ে দিয়েছে, ওই দুয়ারে পূর্ণ ভরসা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গোটা জীবনকালের পুরোটা সময় সে কাটিয়ে দেয়। তার রব (প্রভু প্রতিপালক) তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন ও ভালোবাসার সাথে নিজের কাছে তাকে ঠাঁই দেন এবং ইহজগতের ও পরকালের, উভয় জান্নাতেরই প্রাপ্তি তার হয়, **রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আ'নহু**। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে এমন এক উম্মতের উত্থান ঘটানোর সুসংবাদই হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে খোদাতা'লা দিয়েছিলেন এবং খোদার কসম তিঁনি নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বায়তুল্লাহ
আত্মিক ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা লাভ
এবং
পবিত্রতা অর্জনের মহান কেন্দ্র

জুমুআর খুৎবা
২৬ মে ১৯৬৭

মসজিদ মুবারাক
রাবওয়া

আল্লাহ্’র ঘর– পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্রবিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে এটারই প্রতিচ্ছায়া নির্মাণ করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরণের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় **ছায়া কেন্দ্র** খুলতে হবে, যে গুলো **বায়তুল্লাহ্‌র** প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই, যা **বায়তুল্লাহ্** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহে.) বলেন, গত খুতবা প্রদানের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের ধারবাহিকতায় দশটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেছিলাম। এতে আমি আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছি। ওই খুতবাগুলো প্রদানকালে শুরুতেই আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করে থাকি, আমি বলেছি ওই আয়াতে তেইশটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্য থেকে দশটির ব্যাপারে ইতোমধ্যে কিছুটা আলোকপাত করা সম্পন্ন হয়েছে। বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের এগারো অর্থাৎ **এগারোতম উদ্দেশ্য ত্বাহ্হিরা** বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা বায়তুল্লাহ্কে পাক-পবিত্র রাখার ব্যবস্থা কর, একে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পদ্ধতি অবলম্বন কর, এর নোংরা-ময়লা ধৌত করার বন্দোবস্ত কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, খোদা তাআলা এ গৃহকে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আত্মিক পাক-পবিত্রতার কেন্দ্রে পরিণত করতে চান। এ উদ্দেশ্যটিও খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর) ও আফযালুর রুসূল (নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আবির্ভাবে পূর্ণ হয়েছে। তাঁর আনিত শরীয়তে প্রকাশ্যভাবে দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পালন এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী এক শিক্ষামালা আমরা পেয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার **১৫১** ও **১৫২** আয়াতে বলেন, তোমরা যেখানেই থাকো, যে কাজই তোমরা ইসলামের শরীয়তে বর্ণিত বিধি-বিধানের পথ নির্দেশ অনুযায়ী করো, তাতে এ কথার খেয়াল রেখো যে, তোমাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের উপর এই দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা বর্তানো হয়েছে যে তোমরা ওই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ করায় রত থেকো। আর সমস্ত দুনিয়ায় ও গোটা বিশ্বজগতে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করো আর তা সজীব ও সচল রেখো।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমাদের দৃষ্টি এদিকে আমি আকর্ষণ করছি এ কারণে যে, **বায়তুল্লাহ্'র** সাথে সম্পর্কিত সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি তোমরা সদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো। এটা এজন্য যে, আমি তোমাদেরকে আমার পুরস্কার (নে'মত) পরিপূর্ণ আকারে দিতে চাই। **ওয়ালে উতিম্মা নে'মাতি আলাইকুম।** 'পুরস্কার'এর পরিপুর্ণতাদানের উদ্দেশ্য হলো এই, যা আমি তোমাদের সমক্ষে রাখছি। যদি তোমরা আমার বর্ণিত পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী ওই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করো ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে আমার নির্দেশাবলী পালন করো, তবে তোমাদের জন্য আমার যে পুরস্কারসমূহ নির্ধারিত আছে তা এরূপ বিশেষত্বের হবে আর এমন প্রকারের হবে যে সেক্ষেত্রে

তোমাদের মাঝে পুরস্কারের পরিপূর্ণতা ঘটে গেছে বলেই প্রতিপন্ন হবে। আর **লে উতিম্মা নে'মাতি আলাইকুম**-এর পর আল্লাহ্ তাআলা এটা বলছেন (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৫২) যে, তোমাদের জন্য এক রসূল প্রেরীত হয়েছে যে তোমাদেরকে পবিত্রতার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে 'হে খোদা! উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের বিষয় তো আমরা জানলাম, কিন্তু আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার কার্যকর উপায় ও পন্থাসমূহ এখনও পুরোপুরিভাবে জানা হলো না, যদি পুরোপুরিভাবে জানা হতো তবে আমাদের জন্য সহজসাধ্য হতো'। এ কারণে পরবর্তী ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, আমার প্রিয় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে পথ দেখাচ্ছেন সেটিই ওই পথ যা পবিত্রতার দিকে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় আর যে পথে চলে তোমরা বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে পারো। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, **ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা ওয়া ইউযাক্কিকুম** অর্থাৎ তোমাদের পবিত্র করণের উপায়-উপকরণ এই রসুলের মাধ্যমে আমি সরবরাহ করে দিয়েছি। সেজন্যই, সে তোমাদেরকে আয়াত পাঠ করে শোনায়, কিতাবের শিক্ষা প্রদান করে ও এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে।

অতএব, **ত্বাহ্হিরা**-তে যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে আর এ কথা দ্বারা যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন করা হয়েছে, তার পূর্ণতাদানকারী হলেন নবী আকরাম (স.)। স্বয়ং কুরআন করীম এ দাবী করে যে তিনি (স.) ওই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পূর্ণতাদানকারী। কেননা এখানে **মসজিদ হারাম** (পবিত্র মসজিদ) নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রাখা, নে'মতের পরিপূর্ণতা দান, আত্মার পরিশুদ্ধতা ও পরিশীলতা এবং এ-সব কার্যকর করার পদ্ধতি ও তাৎপর্য, যাবতীয় বিষয়াবলী এ দু'টি আয়াতে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। সুরা বাকারার এ আয়াতে সাধারণ পবিত্রতার কথা উল্লেখিত হলেও অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় পবিত্রতার প্রতি । সূরা মায়েদার ৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তুমি যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে থাকো তবে গোসল করে নাও। এতে এটা শেখানো হয়েছে যে, ইসলাম প্রদত্ত শিক্ষায় দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যকীয় বিষয়। এজন্য নবী করীম (স.) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ দেহ পরিষ্কার রাখা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা, গৃহ নোংরা না রাখা, পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র রাখতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া, কথা-বার্তায় পরিষ্কার সরল-সোজা থাকা, কান পরিষ্কার, চোখ পরিষ্কার, নাক পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা

বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এ-সব শিক্ষার বিস্তারিত বর্ণনায় এখন যেতে চাচ্ছি না আর এর বিশদ উল্লেখে যাওয়া এখন সম্ভবও নয়। যাহোক, কুরআন করীম প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছি তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, কুরআনের শরীয়তের বিধি-বিধানে যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি তার শতভাগের এক ভাগ বরং হাজার ভাগের এক ভাগ গুরুত্বও পূর্ববর্তী কোন ধর্ম দেয় নি।

অতএব, **ত্বাহ্হিরা**-র বাক্য বিন্যাসে অন্তর্নিহিত যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, তা পূর্ণ করতে নবী আকরাম (স.) কে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তিনি (স.) ওই উদ্দেশ্য অর্জন করাটা উম্মতে মুসলেমার জন্য সম্ভবপর করে দিয়েছেন। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিটি দিগন্ত পাকপবিত্রতার প্রতিটি প্রশস্ত পথ তিনিই আমাদের নির্দেশিত করে দেখিয়েছেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি শিক্ষা আর পাক-পবিত্রতার যত শিক্ষা রয়েছে বিশদভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি আমাদের সামনে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর সে সব হেদায়াতের পথ অবলম্বন (স.) করে আমল করা আমাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। এর পূর্বে কোন নবীই এ ক্ষেত্রে এতো বড় মহান কর্ম সাধন করেন নি। অতএব, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা অর্জন এবং তা লাভ করার মাধ্যম নির্ধারিত হয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্ (স.)। আর তা অর্জনের দায়বদ্ধতা বর্তানো হয়েছে উম্মতে মুসলেমার উপর। বিশেষতঃ এ যুগে মুসলমানদের মধ্য থেকে ওই জামাতের প্রতি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন ঘটিয়ে যাদেরকে আজ নবরূপে খোদা ও তাঁর রসূল (স.)-এর জন্য সঞ্জীবিত করা হয়েছে। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের প্রতি কোন ধরনের যাতনা বা কঠোরতা প্রয়োগ করতে চাই না। তোমাদেরকে পবিত্র করা ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা পূর্ণ করা আমার উদ্দেশ্য। যদি আধ্যাত্মিক পাক-পবিত্রতার শিক্ষা না দেয়া হয় তবে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার ও অনুগ্রহ এবং কৃপা অর্ধ-সমাপ্ত থেকে যাবে। কিন্তু **ওয়ালি উতিম্মা নে'মাতাহু আলায়কুম**–তিনি এটাই পসন্দ করেছেন যে তিনি নিজ অনুগ্রহ'কে পূর্ণতা দিবেন ও পুরস্কারেও পরিপূর্ণতা আনবেন। তিনি এ শিক্ষা এজন্য দিয়েছেন, যেন তোমাদের অভ্যন্তরে কোন দুর্গন্ধ, নোংরা-ময়লা ও অপবিত্রতা অবশিষ্ট থেকে না যায় বরং এ শিক্ষা পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র বানিয়ে দেয়।

এভাবে কুরআন করীমে পানি সম্পর্কেও উল্লেখিত হয়েছে যে এর বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। একটি হলো এই যে, এর দ্বারা তোমরা দৈনন্দিন জীবনে ধোঁয়া–মোছা করো, কাপড় চোপড় ধৌত করো, বাসন-পত্র ধুয়ে থাকো, কাদা মাটি ধুয়ে ফেলো, মেঝে ধোয়া-মোছা করো, ঘষামাজা করে দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করো এমনি হাজারও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের ব্যাপার রয়েছে যা পানি দ্বারা করা হয়ে থাকে **(মা'আল্ লেইউ ত্বাহ্হিরাকুমবিহী,** সূরা আনফাল, আয়াত : ১২)। এভাবে কুরআন করীম প্রকাশ্য ও বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্তর্নিহিত ও আত্মিক পাকপবিত্রতা দানকারী শিক্ষায় পরিপূর্ণ। তাই কেবলমাত্র নবী করীম (স.)-এর ব্যক্তিসত্ত্বা হলো তা' যদ্বারা **বায়তুল্লাহ্**-এর মহান এ উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়েছে।

খোদা তা'লার পবিত্র গৃহ পুনর্নির্মাণের **বারোতম উদ্দেশ্য** ও লক্ষ্য **লিত্ত্বাই'ফীন**-এ বর্ণিত হয়েছে। এ কথায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ বার বার এখানে এজন্য সমবেত হবে, যেন তারা পাক-পবিত্রতার শিক্ষা লাভ করতে পারে আর পরবর্তীতে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে এ শিক্ষার (প্রাপ্ত শিক্ষার) বিস্তৃতি দান করে ও এর প্রচার চালায়। এ উদ্দেশ্যও প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে। এ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআন করীমে আদেশ করা হয়েছে–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

[অর্থ– মু'মিনগণের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, তারা সকলে এক যোগে বের হয়, অতএব তাদের প্রত্যেক জামা'ত হতে একদল কেন বের হয় না, যাতে তারা ধর্ম সম্পর্কে পান্ডিত্য লাভ করতে পারে আর তারা যখন তাদের কাছে ফিরে আসে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে যেন তারা (মন্দ পথ সম্পর্কে) সাবধান হয়]

অর্থাৎ মুমেনদের জন্য তো সম্ভব নয় যে সবাই ইসলামের কেন্দ্রে সমবেত হতে পারবে। কেননা ইসলামে সমগ্র জগদ্বাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববাসীর সকলের একযোগে কোন একই সময়ে ইসলামের কেন্দ্রে একত্রিত হওয়ার স্থান সংকুলান কোন ক্রমেই হতে পারে না। তথাপি বিশ্বের জাতিসমূহের কেন্দ্রের সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকাটাও জরুরী। এজন্য আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদের এ শিক্ষা দিচ্ছি যে যেহেতু সকলের এখানে সমবেত হওয়াটা সম্ভব নয় তাই কেন এমন হয় না যে, তাদের জামা'তের মধ্য থেকে এক দল বের হয়ে

কেন্দ্রে এসে ধর্ম পুরোপুরি শিখে নেয় আর পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে নিজ জাতিকে বিধর্ম থেকে রক্ষা করে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাবধান বাণী শুনিয়ে ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা বিপথগামীতা থেকে তাদের রক্ষা করে নেয়।

এখানে কুরআন করীম **উম্মতে মুসলেমা** যারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিদ্যমান আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী ও প্রত্যেক দেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি জামা'তের কেন্দ্রে ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকতে হবে যাতে তারা ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান শিখে আর সময়ের দাবী ও চাহিদা জ্ঞাত থাকে আর এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে যে, বর্তমান যুগে ইসলামের জন্য কোন্ প্রকারের কুরবানীর আবশ্যকতা রয়েছে আর তাদের এটাও জানা হয়ে যায় যে **যুগ-ইমাম** কোন্ পরিকল্পনার অধীনে কী কাজের জন্য তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন আর এর হেকমত– প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানও যেন তারা বুঝে যায়। এতে করে তারা যখন নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে নিজেদের অন্যান্য ভাইদের এটা জানাতে পারবে যে এক্ষণে এ সব স্থানে ইসলামের উপর ওমুক ওমুক দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইসলামের সুরক্ষার জন্য, ইসলামের চিরস্থায়ীত্বের জন্য, ইসলামের উন্নতিকল্পে ও ইসলামের দৃঢ়তা ও মজবুতির জন্য জামাতের সামনে এই কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হচ্ছে। এসব কুরবানী ও সেবার অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মানসিক ভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও আর আমলিভাবে একে অপরের থেকে অগ্রগামী থাকতে প্রচেষ্টা চালাও। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশ কার্যকর করতে নবী করীম (স.)-এর যুগে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা মদীনায় নবী আকরাম (স.)-এর কাছে সমবেত হয়ে নিয়মিতভাবে আসতে থাকতো ও ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান শিখে নিতো। পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা করতো। পরবর্ত্তীতে নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে এভাবে ইসলাম ধর্মের সঞ্জীবনী উপকরণ সৃষ্টি করে দিতো। যে ব্যক্তিরা মদীনায় আসতো তারা নিজেরা ধর্ম-জ্ঞান চর্চা করতে, শিখতে আর অন্যদের শিক্ষা দিতেও নিজ সময় কুরবানী করতো। আর তাদের থেকে ধর্মের জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণকারীরাও খোদা তা'লার পথে নিজেদের সময় ব্যয় করতো। যদি তারা এরূপ না-ও করতো মদীনায় আগমন করায় তাদের নিজেদের আত্মার মঙ্গল লাভ তো হয়েই যেতো তবে অন্যদের তা কোনই উপকারে আসতো না। কিন্তু ওই পরিকল্পনা, ওই ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো এটা ছিল যে, লোকেরা বাইরের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে কেন্দ্রে আসুক, ধর্ম শিক্ষা করুক

ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানুক। পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে এ বিষয়গুলো নিজেদের ভাইদেরকেও জানিয়ে দিক।

অতএব **তোয়াফ** (কাবাগৃহ'কে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘোরা) এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয় না যতক্ষণ তোয়াফকারী এককভাবে ও তোয়াফকারীরা সম্মিলিতভাবে সময়ের কুরবানী প্রদানকারী না হয়। এখানে এটা বলা হয়েছে যে ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার শিক্ষা প্রদান করে। খোদা তাআলা এমন উম্মত সৃষ্টি করে দিয়েছেন যারা নিজেদের সময় কুরবানী করে খোদা ও তাঁর রসূলের ভালোবাসায় কেন্দ্রে সমবেত হয়ে থাকে আর ফিরে গিয়ে খোদা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য নিজ ভাইদের কুরআন শিক্ষা দেয়, ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয় তাদের অবহিত করে, ইসলামের সুরক্ষা ও প্রচারের জন্য যেসব পন্থা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তা বিশদভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করে আর তাদের হৃদয়ে খোদার রাস্তায় কুরবানী প্রদান করার আগ্রহ-উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে দেয়।

সেকালের জাতি-গোষ্ঠীগুলো এ নির্দেশটি খুব ভালভাবেই বুঝেছিল। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

কানা ইয়ানৃত্বালিকু মিন কুল্লি হাইয়্যিম মিনাল আ'রাবি ইছোয়া'বাতুন ফাইয়াত্‌তুনান নাবীইয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ফা ইয়াস আলুনাহু আ'ম্মা ইউরিদুনা মিন আমরি দীনিহিম ওয়া ইয়া তাফাক্‌কাহুনা ফী দীনিহিম (তফসীর ইবনে কাছীর, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৮, সূরা তওবা-আয়াত ওয়া মা কানাল মু'মিনুন)।

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা, আরবের প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নবী করীম (স.)-এর সাহচর্যে থাকতো আর যেসব বিষয় আগে থেকে তাদের অজানা ছিল সেসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতো, জ্ঞান তথা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতো, সমস্যা ও সঙ্কটের প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান শিখে নিজ ধর্মের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এভাবে **তাফাক্‌কুহু ফিদ্দীন** অর্জন করে নিতো। পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে অন্যদেরও তা শেখাতো। আমাদের ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণসহ ওইসব দলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ওই উদ্দেশ্য ও আদেশকে কার্যকর করতে মদীনায় নবী করীম (স.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতো, ধর্ম শিখতে সেখানে কিছু দিন কাটাতো, একদল বিদায় হওয়ার পর দ্বিতীয় দল, পরে তৃতীয় দল, এরপর পুনরায় আরেক দল– এভাবে আসতেই থাকতো। এক ধারাবাহিকতা চলতে থাকতো আর এ ধারাবাহিকতায় ধর্মের

স্থায়ীত্ব ও মজবুতির উপকরণ নিহিত রাখা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে যেমন আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম শেখার উদ্দেশ্যে একবার বাহরাইন থেকে চৌদ্দজন প্রতিনিধির একটি দল এসেছিল। অনুরূপভাবে, হাযরে মাওত (ইয়েমেন) থেকে আশি জনের প্রতিনিধিদল এসেছিল। এভাবে বনু তমহীম গোত্রের সত্তর-আশি জনের একটি দলও এসেছিল। এসব দল **বাকাও বিল মাদীনাতে মুদ্দাতাঁই ইয়া তাআ'ল্লামুনাল্ কুরআনা ওয়াদ্ দীনা ছুম্মা খারাজু ইলা কাওমিহিম** ধর্ম শিখেছে, শিক্ষাপ্রাপ্তরা পরবর্তীতে নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ধর্ম শিখিয়েছে।

আমি কয়েকটি মাত্র উদাহরণ এজন্য উদ্ধৃত করছি যাতে আমাদের জামা'তের কাছে এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকাল তো এমন সব ক্লাসগুলোতে একজন প্রতিনিধিও তারা দেন না, যা এখানে চালু করা হয়ে থাকে। কিন্তু এভাবে উদ্দেশ্য সফল হবার নয়। যথেষ্ট সংখ্যায় লোকদের এখানে আসতে হবে, তবেই আমরা যথার্থরূপে ইসলাম ধর্মের সেবা করতে সক্ষম হবো।

যাহোক, এ বিষয়ে বিস্তারিত ওই সময় বলবো যখন আমি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা সমাপ্ত করবো। এরপর সেই প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা জানাতে শুরু করবো, কেননা এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন মুসলমানদের উপর বিশেষ করে এ যুগে আমাদের– আহমদীদের উপর অর্পিত হয়েছে।

তেরোতম উদ্দেশ্য ওয়াল আকিফীন-এ বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটানো হবে যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার রাস্তায় উৎসর্গকারী হবে আর উৎসর্গকৃতদের এই দলে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্যটিও কেবল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। এর পূর্বে তা পূর্ণতা পাবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা পূর্বের যুগে বিভিন্ন জাতি থেকে প্রতিনিধিরা সেখানে আসতে সক্ষমই ছিল না। মক্কা সম্পর্কে তারা না কিছু জানতো আর না তাদের অন্তরে ওই স্থানের প্রতি কোন ভালোবাসার টান ছিল। আমি পুর্বেই বলেছি, নবী আকরাম (স.) এ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ (সূরাতুল বাকারা, আয়াত : ১৮৮) এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তোমাদের ব্যাপারে এধারণা পোষণ করা

হচ্ছে যে তোমরা মসজিদে **ই'তিকাফ** (ইবাদতের জন্য নির্জনে বাস)-এ বসবে। দুনিয়ার সকল পার্থিব বিষয় ও সম্পর্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুদিন একাগ্রচিত্তে খোদার জন্য নিজ জীবনের প্রতিদিনের চব্বিশ ঘন্টা সময় কাটিয়ে যাও যাতে উৎসর্গকরণের স্পৃহাকে জীবন্ত করে নেয়া যায়। আর যেহেতু নবী করীম (স.) বলেছেন, 'আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানানো হয়েছে', এজন্য **ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ**-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমার ভালোবাসায় উৎসর্গীকৃত হয়ে তোমাদের খন্ড খন্ড ভাবে কিছুটা করে সময় কাটাতে হবে; কেননা যেভাবে আমি প্রথমেই ইঙ্গিতে বলেছিলাম, আল্লাহ্'র ঘর পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্র-বিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে এর প্রতিচ্ছায়াও নির্মাণ করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় **ছায়া কেন্দ্র** খুলতে হবে, যেগুলো **বায়তুল্লাহ্র** প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই যা **বায়তুল্লাহ্** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লাহ্ তাআলা এখানে এটাই বলেছেন যে **আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ**– প্রত্যেক জায়গায় যেখানে উম্মতে মুসলেমা তাক্ওয়া (খোদাভীতি) এর ভিত্তিমূলে **বায়তুল্লাহ্র** প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছায়া প্রতিষ্ঠিত করবে সেখানে তোমাদেরকে উৎসর্গীকৃত হয়ে ই'তিকাফে বসতে হবে, না হলে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। এই ব্যাপারেও আমি অতিরিক্ত বর্ণনা দিতে চাচ্ছি না। তবে আমি মনে করি কাবাগৃহ নির্মাণের একটি উদ্দেশ্য এ-ও যে, জাতির উৎসর্গকারীগণ অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার, প্রত্যেক স্থানের, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর যে উৎসর্গকারী রয়েছে তারা কেন্দ্রে বা ছায়া কেন্দ্রে এসে সমবেত হতে থাকুক আর ইতিকাফে বসে যাক। লক্ষ্যণীয় যে 'উৎসর্গ' (ওয়াকেফ্) ও 'দেশত্যাগ-দেশান্তর' (হিযরত) এ-দুয়ের মধ্যে খুবই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই কেবল মক্কা থেকেই নয় বরং অন্যান্য এলাকা থেকেও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকা পরিত্যাগ করে এমন কী নিজ গোত্রকে ছেড়ে দিয়ে সাধু-সন্যাসীর ন্যায় মদীনায় এসে বসে পড়তো আর এখানেই পড়ে থাকতো।

তাদের সে হিযরত ছিল (দেশত্যাগ) নিজ জাতি গোষ্ঠী ছেড়ে যাওয়া বা নিজ দেশ পরিত্যাগ করা– এটা সে রকমের ছিল না, যা ছিল মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে স্থান ছেড়ে যাওয়ার হিযরত, তবে এমনটি করা এক উৎসর্গকারীর (ওয়াকেফ্) পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে, যে নিজ এলাকা ছেড়ে, স্বীয় আত্মীয়তার বাঁধন ছেড়ে, আপন পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নিজ সহায় সম্পদ ছেড়ে দিয়ে খোদার জন্য কেন্দ্রে এসে পড়ে থাকে আর পরবর্তীতে কেন্দ্রের নির্দেশনা

অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। যেমন– **ইয়েমেন'**-এ **আশআ'রীয়্যাণ** নামে এক গোত্র ছিল। সেখানকার ধর্মপরায়ণ বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রাযি.)। তাঁর সাথে আশি জন সদস্য হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। অনুরূপ আরও অনেক গোত্র রয়েছে। ইতিহাসে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী আকরাম (স.)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করে উপকৃত হতে তারা মদীনায় চলে এসেছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-ও রয়েছেন।

চৌদ্দতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ওয়া রুক্কা অ্যা'স সুজুদ-এ বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে তাঁর (স.) মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বা ও আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে। এর ফলে তারা আনুগত্য, অনুবর্তীতা, সেবা ও আত্মত্যাগ ও কুরবানী প্রদানের এমন নমুনা প্রদর্শন করবে যার উদাহরণ দুনিয়াতে অন্য কোন ধর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর দুনিয়া তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। এ উদ্দেশ্যও নবী আকরাম (স.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। তাঁর (স.) পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে কেবল তাঁর যুগেই নয় বরং পরবর্তীতেও– প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করেন যাঁরা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করায় নিয়োজিত ছিলেন। এর বিশদ বর্ণনায় আমি এখন যেতে চাচ্ছি না, আল্লাহ্ তা'লা যদি সামর্থ্য দান করেন তবে আমি বন্ধুদের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যখন অবহিত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, সে সময় এর বিশদ বর্ণনায় যাবো ইনশাআল্লাহ্!

পনেরতম উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে **বালাদান আমিনান** আয়াতাংশে। এখানে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়ার নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক আক্রমণসমূহ থেকে এ গৃহকে নিরাপদ রাখবেন। একে নির্মূল করার সকল অপচেষ্টাকে অকৃতকার্য করে দেয়া হবে বরং আক্রমণকারীরা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখানে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে আমরা এক বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণেই মক্কার হেফাযত করছি, আরও বলা হয়েছে– মক্কার হেফাযত এজন্য করা হবে, যাতে দুনিয়াতে এ কথা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যে-ই নবী আকরাম (স.)কে আমরা এ স্থানে আবির্ভূত করতে চাই তিনি আমাদেরই হেফাযতে রইবেন আর দুনিয়া এ-ও জেনে যাক, যে শরীয়ত আমরা এখানে অবতীর্ণ করতে চাই, তার রক্ষাকারীও আমরাই।

অতএব, নবী আকরাম (স.)-এর খোদার আশ্রয়ে থাকা আর ওই নির্মল-নিস্পাপ নবীর প্রতি যে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে তা পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার সংরক্ষণে থাকা- এ কথার মাঝে এ দু'টির প্রত্যেকটিরই হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দেয়া

হয়েছে। যেমন কুরআন করীম এ দাবী করে রেখেছে– যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার সত্যায়ণকারী, সত্যতা প্রতিপন্নকারী হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)। কুরআন করীমে আরও বলা হয়েছে **ওয়াল্লাহু ইয়াত্ব’ সিমুকা মিনান্ নাস** এ আয়াতের শুরু এভাবে হয়েছে–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

ইয়া আইইউহার্ রাসূলু বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা (সূরাতুল মায়িদা, আয়াত : ৬৮) অর্থাৎ যে হেদায়াত, যে শিক্ষা, যে শরীয়ত বিধি-বিধান তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কায় আন্তরিকতার সাথে তা প্রচার করো আর জীবনপ্রদায়ী এ পানীয়কে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দাও। তবে তোমাদের আমরা এটা জানিয়ে দিচ্ছি যে, এ প্রচারে জগদ্বাসী সন্তুষ্ট হবে না আনন্দিতও হবে না বরং তারা তোমাদের হত্যা করতে, আহত করে পঙ্গু করতে, তোমাদেরকে নির্মূল করতে, তোমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্তব্ধ করে দিতে হাজার-হাজার ষড়যন্ত্র আঁটবে, তবে তোমরা তাদের ষড়যন্ত্রে ও কুটিলতায় ভ্রুক্ষেপ করবে না, কেননা তোমাদের সাথে আমাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তোমরা আমাদের আশ্রয়ে আমাদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় রয়েছ, আমাদের হেফাযতে রয়েছ। জগৎ যা চায় করুক, পৃথিবীর তাবৎ শক্তি সম্মিলিত হতে চাইলে হোক, তবুও তোমাদের ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না, বিধ্বস্ত করে তোমাদের পতন ঘটাতে পারবে না। এজন্য তোমরা নির্ভয়ে, দৃশ্যতঃ ক্ষতিতেও কোনরূপ শঙ্কিত না হয়ে বরং নিঃসঙ্কোচে নিজেদের ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকো, কেননা আমরা তোমাদের হেফাযতকারী। আমাদের ফিরিশ্তারা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হবে ও তোমাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং হেফাযতে রাখবে।

এ আয়াতের শুরু হয়েছে প্রচারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আর পরবর্তীতে আশ্বস্তও করা হয়েছে। প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন প্রচার করবে তখন তোমাদের বিরুদ্ধে শোরগোল উঠবে, প্রচন্ড ফিৎনা দাঁড়াবে কিন্তু তোমরা ধ্বংস হবে না, জগতে দুঃখ-কষ্ট তো দুনিয়াদারদের পক্ষ থেকে খোদা তা’লার জন্য দেয়াই হয়। তবে তোমরা খোদা তা’লা প্রদত্ত আশ্রয়ে ও নিরাপত্তায় রইবে আর খোদা তা’লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, কোন শক্তিই তোমাদের ধ্বংস করতে, বিনাশ করতে সক্ষম হবে না। এ প্রতিশ্রুতি যদি উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে না দেয়া হতো তবে **বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকা**-এর যে অবশ্য করণীয় কর্তব্য (ফরয) ছিল, তা কখনই পালন করতে পারতো না। কেননা তাদের এ আশংকা হতো যে, শত্রুরা যদি আমাদের ধ্বংস করে দেয় তবে প্রচার কার্যক্রম

তো পুরোপুরিভাবেই বিলোপ পেয়ে যাবে। খোদা তাআলা বলছেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা পড়তে পারো, কেউ কেউ নিহত হতে পারো, কেউ কেউ কারাবন্দী হতে পারো, কারও প্রতি প্রচারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে পারে, কারো কারো বাক স্বাধীনতা হরণ করা হতে পারে, কারো কারো লেখায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে উম্মতে মুসলেমা এ ধরণের সমস্যা ও সঙ্কট থেকে খোদা তা'লার নিরাপত্তায় ও তাঁরই আশ্রয়ে থাকবে। এ ধরনের কোন বিপদই তাদের উপর আসতে পারে না যা তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত করতে পারে।

চিন্তা ভাবনা করলে আপনারা উপলব্ধি করবেন এক যুগ এমন ছিল যে, নবী আকরাম (স.) যদি খোদার হেফাযতে না থাকতেন তবে মক্কার কোন এক ভবঘুরেও তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারতো অর্থাৎ ইসলামকে মুছে দেয়ার জন্য কেবল এক ব্যক্তিই যথেষ্ট ছিল। পরে এমন এক সময় এলো তিন হাজার লোক যদি মরতে প্রস্তুত হয়ে যেতো তাহলেই দৃশ্যতঃ ইসলাম নির্মূল করতে পারতো। কিন্তু খোদা বলে দিয়েছেন, অত সংখ্যক জনবল ও অতটা শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের দেবো না, যাতে ইসলামের উপর ধ্বংসকারী আঘাত হানতে পারে। যেমন বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় তিনগুণ শক্তি নিয়ে তারা এসেছিলো, কোন কোন সাহাবী শহীদও হয়েছেন তথাপি তা মুছে যেতে দেননি। আবার মক্কায় তথা আরবে ইসলাম যখন দৃঢ়তা লাভ করেনি বা প্রতিষ্ঠা পায়নি তখন পারস্য সম্রাট বা রোমান সম্রাটকে খোদা এ অনুমতি দেননি যে তারা ইসলামকে মুছে দিতে চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু আরব দেশে ইসলাম যখন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, পারস্য ও রোমান সম্রাটদেরকেও তখন অনুমতি দেয়া হলো যে, যতটা পারে ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রসর হোক, এতে বিরোধিতায় যতটা তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তা করেও নিলো। কিন্তু সর্বদাই তারা নিষ্ফলতার মুখ দেখলো আর সব থেকে বড় যে ঐশী নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো তা হলো– বিরুদ্ধবাদীদের এতটা শক্তি কোন সময়েই দেয়া হয়নি যে তারা উম্মতে মুসলেমাকে সার্বিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এক অংশ কুরবানী দিয়েছে, অন্য এক অংশ থেকে আল্লাহ্ তা'লা কুরবানী গ্রহণ করতে চেয়েছেন, এতে প্রফুল্লতার সাথে তারা তাঁর রাস্তায় বিপদাবলীর পাহাড় অতিক্রম করেছে। কিন্তু উম্মতে মুসলেমা বাস্তবে 'এক উম্মত' হিসেবেই সর্বদা খোদার আশ্রয়ে ও খোদার দেয়া নিরাপত্তাতেই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগে দাজ্জালী শক্তি এতটাই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছে যে, যদি তারা চাইতো বা যদি তারা চায় তবে সমগ্র দুনিয়ার বুকে সব মুসলমানকেই হত্যা করতে পারে। কিন্তু খোদা তাআলা যেমন পূর্বে ভিন্ন রকম (মু'জেযা) ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন একালেও

তেমনই মু'জেযা দেখাচ্ছেন যে, মানব-বিবেকের উপর ফিরিশ্তাদের পাহারা বসিয়ে দিয়েছেন আর তাদের বলে দিয়েছেন যে, এ যুগ অস্ত্রের দ্বারা ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার যুগ নয়, দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীতা হওয়া উচিত। তাদের শক্তি তো রয়েছেই, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের দৃষ্টিকে-মনোযোগকে এথেকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন যাতে তারা শক্তি দিয়ে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের বিনাশ করতে চেষ্টা চালাতে না পারে। যাহোক আজকাল, দাজ্জাল যদি বৈষয়িক শক্তি অস্ত্র-বল ব্যবহার করে সব মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে সে শক্তিতো তাদের আছে, তবে খোদা বলেন শক্তি তো দিয়েছি কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করার অনুমতি দেবো না। যেভাবে নবী আকরাম (স.)কে বিশেষ হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে ও একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উম্মতে মুসলেমাকেও বিশেষ হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে। কার্যতঃ আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়াতে কখনও বিরুদ্ধবাদীদের এ সুযোগ বা অনুমতি দেননি যে, তারা উম্মতে মুসলেমাকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলবে। নিজেদের অবস্থাটা দেখে নাও, এক যুগ ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে হত্যা করতে একজনই যথেষ্ট ছিল। তাঁর (আ.) আশে পাশে জামা'ত তখনও সংগঠিত হয়নি। একবার দিল্লী সফরকালে কেবল কয়েকজন মাত্র তাঁর সাথে ছিল। খুবই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। বাইরের প্রাচীর ও সদর দরজা ভেঙ্গে বিরোধীরা বাড়ীর ভিতরে উঠোনে ঢুকে পড়লো ও অন্দরমহলের দরজা ভাঙ্গতে উদ্যত হলো। কিন্তু কী জানি অজানা কোন্ এক কারণে, তারা পলায়নপর হয়ে ফিরে গেলো! তারা কেন পালালো? এ প্রশ্নের উত্তর এ আয়াতে রয়েছে– যে ব্যক্তি খোদা তা'লার হেফাযতে থাকে বা যে জাতি খোদা তাআলা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে, দুনিয়ার কোন ষড়যন্ত্রকারী, জাগতিক কোন কুটিলতা, দুনিয়ার কোন ক্ষমতাধর, তাকে বা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। আর এই যে প্রতিশ্রুতি- এটা মনোবল সুদৃঢ়কারী ও কুরবানী প্রদানে উদ্দীপ্তকারী এক বাণী।

দ্বিতীয়ত এতে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, যে শরীয়ত এই নবীকে দেয়া হবে তা-ও সুরক্ষিত থাকবে যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ۝١٠

ইন্না নাহনু নায্যালনাজ্ জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন (সূরাতুল হিজর আয়াত : ১০)। অর্থাৎ এই যিক্র এই কুরআন করীম আমরাই অবতীর্ণ করেছি আর এর হেফাযতের উপায়-উপকরণ যোগান দেয়াটাও আমাদেরই দায়িত্ব।

যেভাবে চেয়েছেন তিঁনি হেফাযত করেছেন এবং এখনও করে চলছেন। যখন কাগজের উপর হাতে লেখা কুরআন করীম প্রচারের মাধ্যমে এর হেফাযত করা যাচ্ছিল না, তখন লক্ষ লক্ষ মেধাবীদের– প্রখর স্মৃতিশক্তিধারীদের এ কাজের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাদের এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে তারা যেন কুরআন করীম মুখস্ত করে নেয়। তাদের মধ্যে এমন হাজার হাজার হাফেয সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মুখস্ত করাটা এতই নিখুঁত যে, তারা কখনও 'যের-যবর' এর ভুলও করে না। তবে সম্মিলিতভাবে যখন তারা নিজেদের মধ্যে মুখস্ত-চর্চা করে তখন কোন একজন যদি কোন ভুল করেই বসে, তৎক্ষণাৎ তা শুধরে দিতে অন্য একজনকে সেখানে উপস্থিত পাওয়াই যায়। অর্থাৎ কুরআনের হাফেযগণ সামগ্রিক অর্থে কুরআন পাঠে ভুল করতে পারে না।

অতঃপর এটা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে কুরআনের হাফেযগণের এই আধিক্য আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অভিপ্রায়ের অধীনে সৃষ্টি হয়েছিল। যখন থেকে কুরআন করীম কাগজে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে হাফেযের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চলছে, তা থেকে আমাদের এ ধারনা লাভ হয় যে, ওই পদ্ধতিটা আল্লাহ্ তা'লারই সৃষ্ট পদ্ধতি। মানবীয় চেষ্টার সেখানটায় কোন ভূমিকা ছিল না।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, হেদায়াতের ক্ষেত্রে প্রতি শতাব্দীতেই আল্লাহ্ তা'লা এমনিভাবে বুযুর্গ ধর্মপরায়ণ আউলিয়া গণের জন্ম দিয়েছেন, শতাব্দীর শুরুতেও, মধ্যবর্তী কালেও আবার শেষেও; এরা খোদা প্রদত্ত সামর্থ্য অনুযায়ী খোদা তা'লার এতটা নৈকট্য লাভকারী ছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। নিজেই তাদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা সময়ের চাহিদা পূরণকারী ছিলেন। স্বীয় যুগের সমস্যাবলীর সমাধাকারী ছিলেন। উত্থিত ঝগড়া ফাসাদ ও মতদ্বৈধতার মীমাংসাকারী ছিলেন।

আবারও এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাই সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয়কল্পে অনন্য সাধারণ বিশাল এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলছেন। ইসলামের জ্যোতির বিস্তৃতি দানের উদ্দেশ্যে তিঁনি কেবলই নিজ অনুগ্রহে এ সামর্থ্য আমাদের দান করেছেন যে, আমরা তাঁর (আ.) জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আমাদের জন্য তিনি সেটি কার্যকর করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এভাবে যে, আমরা চাইলে যেসব কুরবানী আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে চান সেই কুরবানী প্রদান করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। খোদা করুন আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হই, আর আমাদের প্রত্যেকেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভকারী হউক।

অতএব, আক্ষরিক ও শাব্দিক এবং তাৎপর্যগতভাবেও পবিত্র কুরআন করীমের হেফাযত আল্লাহ্ তা'লাই করছেন। এমন এমন অবস্থার মধ্যে এমন সব উপায় ও পদ্ধতিতে তিনি এর হেফাযত করে চলেছেন, বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না যে– যে ভাবে ও যে পন্থায় কুরআন করীম হেফাযত করা হয়েছে তা মানবীয় কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল নয়, শুধুই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলাফল। বিশেষভাবে তাঁরই হেফাযতের কারণে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সত্য, কথা দিয়ে তিনি কথা রাখেন নিজ ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেনও।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সবর্দা এ দোয়া করতে থাকা উচিত যে, আমাদেরকেও তিনি ওই অনুগতদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন, 'তোমরা কুরআন করীমের তাৎপর্য সংরক্ষণ করো'। অর্থাৎ তারা পবিত্র কুরআনের প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞান লাভকারী হউক। নিজ কামনা-বাসনার দাসত্ববৃত্তি অবলম্বনকারী না হোক। নিজ পার্থিব লালসা চরিতার্থ করতে পবিত্র কুরআন ব্যবহারকারী না হোক। নিজ প্রভু প্রতিপালকের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন করীমের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা অর্জনকারী হোক, খোদা তা'লার সেই প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হোক, যাদের প্রতি খোদা তাআলা নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন আর যাদের কাছে ওই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ মহান কিতাবের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সুপ্তজ্ঞান সমূহের পর্দাগুলো উন্মোচিত করে দেয়া হয়। তিঁনি আমাদের সেই সব লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করুন যাদের মুখে কুরআন উচ্চারিত হয় বটে কিন্তুতাদের অন্তর কুরআনের আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে

কুরবানী প্রদানকারীদের আমল বিনষ্ট হয় না

জুমুআর খুৎবা
২ জুন ১৯৬৭

মসজিদ মুবারাক
রাবওয়া

‘বায়তুল্লাহ্’এর আশিস ও কল্যাণ দর্শনে জগৎ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে– আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টির জন্য যে সব ব্যক্তিবর্গ চূড়ান্ত কুরবানী দিয়ে থাকে এবং পার্থিবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র তাঁরই হয়ে যায় তাদের আমল বিনষ্ট হয় না বরং গৃহীত ঐসব আমলের উত্তম বিনিময়ে বর্ধিত কলেবরে তাদের ফললাভ হয় এবং তাদের বিনীত ও প্রেম-ভক্তিপূর্ণ কর্মের উৎকৃষ্ট পরিণতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহে.) বলেন–

পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের **ষোলতম উদ্দেশ্য ওয়ারযুক্ব আহ্লাহূ মিনাস সামারাত** এ বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে বায়তুল্লাহ্'র আশিস ও কল্যাণ দর্শনে জগৎ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে– আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য যে সব ব্যক্তিবর্গ চূড়ান্ত কুরবানীসমূহ দিয়ে থাকে এবং পার্থিবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র তাঁরই হয়ে যায় তাদের আমল বিনষ্ট হয় না বরং গৃহীত ঐসব আমলের উত্তম বিনিময়ে বর্ধিত কলেবরে তাদের ফললাভ হয় এবং তাদের বিনীত ও প্রেম-ভক্তিপূর্ণ কর্মের উৎকৃষ্ট পরিণতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

কুরআন করীম নিজে এ দাবী উপস্থাপন করেছে যে, এ উদ্দেশ্যটিও নবী করীম (স.)-এর সত্ত্বায় ও কুরআনে বর্ণিত শরীয়তের বিধিবিধানে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে সূরা কাসাস-এ উল্লেখ করেছেন–

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ

كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

ওয়া ক্বালূ ইন্নাতাত্তাবিই'ল হুদা মাআ'কা নুতাখাত্ত্বাফ্ মিন আরযিনা আওয়ালাম্ নুমাক্কিল্ লাহুম্ হারামান্ আমিনাঁই ইয়ুজবা ইলাইহি সামারাতু কুল্লি শাইয়্যির রিযক্বাম্ মিল্ লাদুন্না ওয়া লাকিন্না আকসারুহুম লা ইয়া'লামূন (আল কাসাস, আয়াত : ৫৮)।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, কুরআন করীমে সম্বোধিত ব্যক্তির কাছে কুরআন করীমের বিধি-বিধান, কুরআন করীমের পথ-নির্দেশনা ও শিক্ষামালা যখন উপস্থাপন করা হয় তখন সে বলে থাকে যে এই হেদায়াতের যে জ্যোতি নিয়ে আসা হয়েছে যদি আমরা তা গ্রহণ ও অনুসরণ করি তবে নিজ দেশ থেকে আমাদের উচ্ছেদ করা হবে, দুনিয়া আমাদের শত্রু হয়ে যাবে ও আমাদের বিরুদ্ধাচরণে লেগে যাবে; আমাদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে, আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠব না। এমতাবস্থায় আমরা ওই হেদায়াতের পথে ঈমান এনে তা অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ কেন সৃষ্টি করতে যাব? আল্লাহ্ তা'লা বলেন **আওয়াল্ লাম্ নুমাক্কিল্ লাহুম্ হারামান আমিনান** তারা কি জানে না যে আমরা এই নবীর আর এই শরীয়তের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য পবিত্র কাবাগৃহের চারদিকের প্রাচীর ঘেরা

হেরেম-এর সাথে রেখেছি। **বায়তুল্লাহ্কে** এক নিদর্শন বানিয়েছি– এ কথার অর্থ এই নবী আর তাঁর মান্যকারীরা আল্লাহ্ তা'লার হেফাযতে থাকবে। যে শরীয়ত তাঁর উপর অবতীর্ণ হবে তার হেফাযতের দায়িত্বও কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই। পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের 'হেরেম শরীফ' (চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত স্থান) সুরক্ষিত করার, হেফাযতে রাখার যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। আক্রমণকারীরা সর্বদা নিজেদের আঘাতে নিজেরাই জর্জরিত হয়েছে, পরাস্ত ও পরাভূত হয়ে অপমানিত অপদস্ত হয়েছে, পেয়েছে সাজা। পৃথিবী তাদের ওই অকৃতকার্যতারই সাক্ষী আর এরূপই সাক্ষী হতে থাকবে যে, নবী করীম (স.) ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে– দুনিয়ার কোন শক্তি, দুনিয়ার কোন পরিকল্পনা, দুনিয়ার কোন ষড়যন্ত্র কখনও ধ্বংস করতে পারবে না। আর না কোন মিথ্যা, কুরআন করীমের শরীয়তে অনুপ্রবেশ করতে পারবে, আর না পারবে তাতে দখলদারিত্ব চালাতে। আল্লাহ্ তা'লা এখানে এ-ও বলেছেন যে, ওরা কী দেখে না যে আমরা এদেরকে সুরক্ষা দিয়েছি, আর নিরাপত্তাদানকারী- গৃহে জায়গা দিয়েছি। আমরা সুরক্ষিত করেছি চারদিক প্রাচীর ঘেরা **'কাবাগৃহের হেরেম'**কে, **'মর্যাদার প্রাচীর ঘেরা হেরেম'** নবী আকরাম (স.)-কে এবং **'ইসলামের শরীয়তের প্রাচীর ঘেরা হেরেম'** অর্থাৎ কুরআন করীমকেও। এগুলো সবই সুরক্ষিত জিনিষ, সুরক্ষিত সত্ত্বা, সুরক্ষিত মর্যাদা। যদি তোমরা ওই 'হেরেম' এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে নিয়ে তা সুদৃঢ় করে নাও, তবে যেভাবে **হেরেম শরীফ** খোদা তা'লার হেফাযতে রয়েছে সেভাবে তোমরাও তাঁর হেফাযতের আওতায় এসে যাবে আর একথা ভুল প্রতিপন্ন হবে যে **নুতাখাত্ত্বাফ মিন আরযিনা** পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাদের ক্ষতি করতে পারে!

আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলেছেন **ইয়ুজবা ইলাইহি সামারাতু কুল্লি শাইয়্যির** অর্থাৎ **হেরেম**-এর সাথে আমি এ বিষয়ও যুক্ত করে দিয়েছি যে প্রত্যেক প্রকার ফল এখানে ন্যস্ত করা হয়েছে অর্থাৎ এর সাথে সম্পর্ক গড়ে সর্বপ্রকার **আমলে সালেহ** যথোপযুক্ত কর্ম সাধন করা সম্ভবপর হয়ে যায়। এর সামর্থ্যও মানুষ আল্লাহ্ তা'লা থেকেই পেয়ে থাকে আর এর উত্তম পরিণামের প্রতিশ্রুতিও দেয়া রয়েছে। অতএব যেকেউ একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আর নিজের অভ্যন্তরে কোন প্রকারের বাধা-বিঘ্ন না রাখে, সে ওই ফলসমূহ লাভ করে থাকে; এজন্য এখানে **ইয়ুজবা ইলাইহি সামারাতু কুল্লি শাইয়্যির** 'হেরেম' এবং হেরেমস্থ *'উকুফে আরাফাত'* (দাঁড়ানোর স্থান– যে স্থানে কোন প্রাণী বধ করা নিষিদ্ধ)

ওয়া ক্বালু ইন্না তাত্তাবিইল হুদা মাআ'কা নুতাখাত্ত্বাফ মিন আরযেনা–কে নাকচ করতে বাস্তব ও প্রামাণিক এক দলীল উপস্থাপন করছে। এর মূলতত্ত্বকে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার মাঝে যেসব দৃষ্টিকোণ ও প্রতিদানের উল্লেখ রয়েছে সেসবের নিষ্কলুষ ও নিখাদ সম্পর্ক নবী করীম (স.) ও উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাথে অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এসব ফল– যেগুলো **মিনাস সামারাত**-এ বর্ণিত হয়েছে সেসবের তফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) কুরআন করীমের সুরা 'মুহাম্মদ' এ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ة وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ...

মাসালুল জান্নাতিল্ লাতী বুইদাল মুত্তাক্বুন ফীহা আনহারুম্ মিম্মায়িন গায়রি আসিনীন ওয়া আনহারুম মিল্‌নাবানিল্লাম্ ইয়াতাগাইয়্যার ত্বোয়া'মুহূ ওয়া আনহারুম্ মিন্ খামরিল্ লাযয্াতিল লিশ্‌শারিবীনা ওয়া আনহারুম মিন আ'সালিম্ মুছোয়াফ্‌ফান ওয়া লাহুম ফীহা মিন কুল্লিস সামারাতি ওয়া মাগফিরাতুম্ মির্ রাব্বিবহিম... (৪৭ সূরা মুহাম্মদ : ১৬)।

আল্লাহ্ তা'লা এখানে বর্ণনা দিয়েছেন– খোদাকে ভয় করে তারা, যারা এ পথনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করে। যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে **হুদাল্লীল মুত্তাক্বীন** (সূরা বাকারার শুরুতে রয়েছে) তাদের দৃঢ় ঈমান ও পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ধর্মবিশ্বাস যা তারা ধারণ করে, ইহজগতে রূপকভাবে তাকে এক উদ্যান আকারে, বৃক্ষরাজির অবয়বে সৃষ্টি করে দেয়া হয় আর পরকালে বাস্তব আকারে তা বৃক্ষরাজির রূপ পরিগ্রহ করে। আল্লাহ্ তা'লা এখানে একথা বলেছেন যে, আমার পথ নির্দেশনায় জীবন যাপন করে যেসব ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই মুত্তাকীতে (খোদাভীরু) পরিণত হয়ে যায় তাদেরকে এক জান্নাত দান করা হয় যাতে সকল প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো হয়ে থাকে আর **ফীহা আনহারুম মিম্মায়িন গায়রি আসিনীন** তাদেরকে 'আমলে সালেহ' সময়োপযোগী সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য দান করা হয়। তাদের হৃদয়ে স্বস্তি ও প্রশান্তি দান করা হয়।

ফলে, এতে (আমলে সালেহ) বিদ্যমান সে মজা ও স্বাদ চেখে নেবার পর তারা কোন মূল্যেই তা ছাড়তে প্রস্তুত নয়। যেমন তিনি বলেছেন ওই 'আমলে সালেহ্'কে এমন স্রোতস্বিনী ধারায় পরিবর্তিত করে দেয়া হবে যে ইহজীবনেও আর পরকালেও তাতে এমন পানীয় সংরক্ষিত হতে থাকবে যা দূষিত হবার নয় অর্থাৎ একবার **আমলে সালেহ**-র এক চুমুক পান করে নেয়ার পর এ চুমুকরত থাকা অবস্থা আর পরিত্যাগ করবে না। এতে করে যখন তারা সুদৃঢ় ঈমানের কারণে ওই পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তা **(আমলে সালেহ্)** যথোপযোগীভাবে সর্বান্তঃকরণে পালনে রত হয়ে যাবে তখন বর্ধিত আধ্যাত্মিক উন্নতির দুয়ারসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। সে সব বিষয় যা ছিল আধ্যাত্মিক রহস্য তা তাদের কাছে উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর এর ফলে মুমেন'এর আধ্যাত্মিকতা উন্নতি লাভ করবে। এ অবস্থা **আনহারুম মিল্লাবানিল্লাম ইয়াতগাইয়্যার ত্বোয়ামুহূ** এমন 'এক চলা'-য় রূপ নিবে যে, পথ হারাবার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। আধ্যাত্মিক এই জ্ঞানের কারণে পাপের মর্মপীড়ায় অনুশোচনা ও অনুতাপে দগ্ধিভূত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় প্রেমপূর্ণ এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে। নিজ গলায় সে নিজেই মৃত্যুফাঁস টেনে নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে নিজেকে লীন করে দিবে, সর্বদা তাঁরই প্রেমে আত্মহারা রইবে। এ অবস্থাকে **আন্হারুম্ মিন খামরিল্ লাযযাতিল লিশ্ শারিবীন**-এর রূপ দেয়া হবে। এখানে এ-ও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর অভিজ্ঞতা রাখে না সে এর স্বাদ সম্পর্কে কী করে জানবে! এ কারণেই এমন লোকেরা ঐশী-প্রেম লাভে মনোনিবেশ করে না। কেননা, বহু পরীক্ষা ও বিপদাবলীর কাঁটা ওই ঝরণাধারার আশ্-পাশে বপন করা হয়েছে। কিন্তু যেকেউ একবার এর মজা চেখে নেয় আর আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা যার লাভ হয়ে যায়, সে-ই কেবল বলতে পারে যে, ওই স্বাদ যা ঐশী-প্রেমে বিদ্যমান তা আর অন্য কিছুতেই নেই। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, যেকেউ আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে বিলীন হয়ে যায় তার নিয়তিতে **আনহারুম্ মিন মুসাফ্ফা** নির্ধারিত হয়ে যায়, যাবতীয় রোগ-ব্যাধি থেকে সে নিরাময় লাভ করে আর পুণরায় তাকে কোন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত করতে পারে না; সে পরিপূর্ণভাবে নিরাময় লাভ করে থাকে। সব রকম শয়তানী আক্রমণ থেকে সে এমনভাবে সুরক্ষিত হয়ে যায় যেন সে খোদার কোলে আশ্রয় পেয়ে গেছে, কোন প্রকার ভয়ের কোনই আশঙ্কা তার আর থাকে না। এই যে অবস্থা, তা **আনহারুম মিন আসালিম্ মুসাফ্ফা** রূপে ইহজগতে একভাবে এবং পরজগতে ওই জগতের রূপ অনুযায়ী সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলেন **লাহুম ফীহা মিন কুল্লিস সামারাত**-এর যে ফল,তা তোমরা 'ইসলাম' থেকে পাবে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের ফল তোমাদেরকে দেয়া হবে। সেখানে সব প্রজাতির উদ্ভিদ থাকবে, যা হবে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ধর্ম-বিশ্বাস, আর সে'টি এক বৃক্ষের রূপ পরিগ্রহ করবে। তোমাদেরকে আরও এমন ঈমান দান করা হবে যে তোমরা আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে সব রকম দুঃখ কষ্ট বরণ করে নিয়ে **আমলে সালেহ্** সম্পাদন করতে নিয়োজিত থাকবে আর ওই 'আমলে সালেহ'কে পানির স্রোতধারার রূপদান করা হবে যা থেকে ওই উদ্যানের খাদ্য সরবরাহ ও পরিচর্যা লাভ হবে। পানি ছাড়া উদ্যান জীবিত থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষও আমলে সালেহ ছাড়া পরিশুদ্ধ 'ধর্ম-বিশ্বাস' এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। **আমলে সালেহ** যদি বহাল রাখা না হয় তবে অবধারিত রূপে ধর্মবিশ্বাসও বদলাতে হয়। **বুয়িদাল মুত্তাকুন** এ এই ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। এজন্য একথা বলা সমীচীন নয় যে কুরআনের শরীয়ত বিধি-বিধান মানলে কোন মন্দ সৃষ্টি হতে পারে কেননা কুরআন করীমের শিক্ষায় কোন মন্দই সৃষ্টি হতে পারে না। তবে এ ধর্মবিশ্বাস পালন করতে তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেছেন যে, **ওই আমলে সালেহ্** পালনের সামর্থ সে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে লাভ করবে। এতটাই লাভ করবে যে **গায়রে আসেনীন**– পুণরায় তার এ ভয় থাকবে না যে শয়তান ফুঁসলিয়ে তাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে।

এরপর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও রহস্য তার কাছে প্রকাশিত হয়ে দুগ্ধের ন্যায় হবে। আধ্যাত্মিক রহস্যের এই প্রকাশ তার অন্তরে নিজ প্রভূ-প্রতিপালকের জন্য অনন্ত-প্রেম সৃষ্টি করে দিবে আর এই ঐশীপ্রেম **আনহারুম মিন খামরিল্ লাযযাতিল্ লিশ্ শারিবীন** এ রূপ নিবে। ফলে সে সর্ব প্রকারের আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে অর্থাৎ **আনহারুম মিন আ'সালিম মুছোয়াফ্‌ফা**–তার জন্য সহজবোধ্য ও সহজপ্রাপ্য হয়ে যাবে। অতএব এটাই ফল, যা ইসলাম তাকে প্রদান করে। এই ফল-ই যার উল্লেখ ওই আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) দোয়ায় করেছিলেন **ওযারযুক্ব আহলাহু মিনাস সামারাত**।

ওয়া মাগফিরাতুম্ মির রাব্বিবহিম আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই ফল কেবল তোমাদের কৃতকর্মের জন্য পাওয়া সম্ভব ছিল না যদি না তোমরা আল্লাহ্ তা'লা থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত না হতে। তোমাদেরকে ক্ষমা করার এ প্রতিশ্রুতিও কেবল ইসলামেই দেয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ আয়াতের প্রতি নির্দেশ তো করেননি তবে আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি আর আপনারাও যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে এ আয়াতের মর্মবাণীই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই উদ্ধৃতিটিতে বর্ণনা করেছেন যা এখনই আমি আপনাদের পাঠ করে শুনাচ্ছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তকে বলেন,

> এবারে আমি ওই বিষয়ের কিছু কথা প্রকাশ করতে চাই যে, ইসলামের ফলসমূহ কী জিনিষ! যাতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, নিজের সাহায্যকারী বন্ধুর প্রকৃত অন্বেষণকারী কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কোন কৃত্রিমতা বা লৌকিকতায় নয় বরং প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে স্বীয় প্রতিটি শক্তি-সামর্থ্যকে তাঁরই কাজে নিয়োজিত করে নেয় তবে তার সেই অবস্থার শেষ পরিণতি এই-ই হয়ে থাকে যে খোদা তা'লার 'হেদায়াত'-এর উন্নততম বিকাশ যাবতীয় অন্তরাল পেরিয়ে সকল আড়াল ছিন্ন করে তার সম্মুখে উন্মিলীত হয়। বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ ও আশিস তার উপর বর্ষিত হতে থাকে। ওই সব ধর্ম-বিশ্বাস যা কেবল দেখাদেখি ও শোনাকথা হিসেবে মান্য করা হয়েছিল, এখন সে-সব সত্য-স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন এবং দৃঢ় প্রত্যয় দানকারী ইলহাম আকারে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে দৃশ্যমান অকাট্য সত্যে রূপ নেয়। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত ধর্মীয় বিধি-বিধানের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও গোপন রহস্য তার কাছে উন্মোচিত হলে, ঐশী জগতে পরিভ্রমণ করানো হয় তাকে, যাতে সে বিশ্বাসে আর ধর্মের গূঢ়-তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তার কথনে ভাষণে, কথায় ও কাজে, গতিশীলতায় ও ধীরতায় এক কল্যাণ নিহিত রাখা হয়। সাধ্যাতীত বিনয় ও নম্রতা, সবলতা ও দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বীরত্ব তাকে প্রদান করা হয় এবং নেতৃত্বের এক মহান মর্যাদায় তাকে অধিষ্ঠিত করা হয়। মানবীয় প্রেমের ঘাটতি ও মনুষ্যত্বের অভাবে হৃদয়ের ভাঙ্গন, অন্তরের সঙ্কীর্ণতা, হীনমন্যতা ও নীচতায় বারবার পদস্খলন, জৈবিক চাহিদার দাসত্ববৃত্তি, নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার আর কামনা-বাসনার হরেক রকমের লোভ-লিপ্সার আঁধার তার থেকে পুরোপুরী বিদূরীত করে সেস্থানকে আল্লাহ্ ওয়ালা খোদাভীরু উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন পবিত্র গুণাবলীর জ্যোতিতে পূর্ণ করে দেয়া হয়। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে সে তখন

নব জন্মের এক পোশাক পরিধান করে নেয়। এ অবস্থায় সে খোদা তা'লার সাথে শুনে, খোদা তা'লার সাথে দেখে, খোদা তা'লার সাথে চলে-ফিরে আর খোদা তা'লার সাথেই অবস্থান করে। তখন তার প্রদত্ত শাস্তি খোদা তা'লার শাস্তি, তার কৃপা খোদা তা'লার কৃপায় পরিণত হয়। ওই পদমর্যাদায় তার কৃত দোয়া পসন্দনীয় হওয়ার কারণে গৃহীত হয়ে থাকে, কোন পরীক্ষা করতে নয়। তখন পৃথিবীতে তার বিদ্যমানতা **হুজ্জাতুল্লাহ্** আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও প্রমাণ প্রদর্শনার্থে এবং **আমানুল্লাহ্** আল্লাহ্ প্রদত্ত শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে বিরাজমান থাকে। আর তার অস্তিত্বের কারণে স্বর্গে আনন্দ-উল্লাস চলতে থাকে। উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর সব প্রতিদান প্রতিনিয়ত তাকে দেয়া হতে থাকে। **মুকালেমাতে ইলাহিয়া ও মুখাতাবাতে হযরতে ইয়াযদানী** পরম উপাস্যের সাথে বাক্যালাপ ও ঐশী-সম্বোধনের মর্যাদা সে লাভ করে বিনাকষ্টে আর সন্দেহ ও সংশয়াতীতভাবে। চাঁদের আলোর ন্যায় সেই সব বাণী ও সম্বোধন তার হৃদয়ে অবতীর্ণ হতে থাকে, যা নিজের মাঝে গভীর প্রভাব বিস্তারী এক স্বাদ ধারণ করে রাখে আর বিতরণ করে শান্তি-আরাম, সান্তনা-প্রবোধ, স্বস্তি ও তৃপ্তি (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২২৬-২৩১)।

এই ফলসমূহের প্রতিশ্রুতিই হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে প্রদান করা হয়েছিল। সেই ফলসমূহ উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে এত অধিক পরিমাণে প্রদান করা হয়েছে যে,তা দেখে দর্শনার্থী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

সতেরতম উদ্দেশ্য রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না-এ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– আমল কোন জিনিসই নয় যতক্ষণ তা গৃহীত না হয়। এজন্য আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্জন করা কেবল দোয়ার দ্বারাই সম্ভবপর হতে পারে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে এখানে এক মহান নবী আবির্ভূত হবেন আর তার আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রভাবে এমন এক উম্মত সৃষ্টি হবে যারা এ তাৎপর্য্য অনুধাবন করবে যে বড় বড় কুরবাণীও নিরর্থক ও নিষ্ফল হবে যতক্ষণ বিনীত দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করা না হয়। অতএব দোয়ার মাধ্যমেই তারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে আর দোয়ার কারণেই কৃত আমলের উত্তম ফল তারা পাবে।

কুরআন করীম এই তিনটি লক্ষ্যের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছে। আমার দৃষ্টিতে দোয়া ও কবুলীয়তে দোয়া অর্থাৎ দোয়া করা আর দোয়া গৃহীত হওয়া বিষয়ে ইসলাম যতটা আলোকপাত করেছে অন্য কোন ধর্মই তা করে নাই। অন্য

কোন ধর্ম এ বিষয়ে এর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফুরকান-এর শেষ অংশে **ইবাদুর রহমান**-এর বিষয়ে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন যে ইবাদুর রহমান হচ্ছে তারা যারা এমন এমন সব সৎ-কর্ম করে থাকে আর এমন-এমন সব মন্দ কর্ম করা থেকে বিরত থাকে... ইত্যাদি... ইত্যাদি। **আর রহমান**-এর অর্থ হল ওই পবিত্র সত্ত্বা (আল্লাহ্) যিনি কোন কাজ না করা সত্তেও বিনা কাজেই কাউকে প্রতিদান দেন অথবা কেউ কৃপা-দয়া বা অনুগ্রহ-অনুকম্পা পাওয়ার যোগ্য না হলেও নিজ থেকে করুণা বর্ষণ করেন। এর পূর্বের আয়াতগুলোতে **ইবাদুর রহমান** এর কৃত আমলের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে যার সাথে দৃশ্যতঃ **রহীমীয়্যত** (বার বার কৃপাকারী)-এর গুণাবলী সম্পর্ক রাখে।

অতএব এখানে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে যথোপযুক্ত সৎকাজ তোমরা যতই কর না কেন, যতক্ষণ না **রহীমীয়্যতের** সাথে **রাহমানীয়্যত**-এর কল্যাণকর প্রভাব যুক্ত হচ্ছে তোমাদের কোনই প্রতিদান লাভ হবে না। এ জন্যই এ বিষয়বস্তুর শেষে গভীর তাৎপর্যবহ বাক্যে বলা হয়েছে–

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٨﴾

কুল মা ইয়াঅ্ বাউ বেকুম রাব্বি লাওলা দোয়াউকুম ফাকাদ কাজ্জাবতুম ফাসাওফা ইয়াকুনু লিযামা (সূরাতুল ফুরকান, আয়াত : ৭৮) অর্থাৎ এটা সঠিক যে আমলে সালেহ সম্পাদন করাটাও জরুরী আর মন্দকর্ম থেকে নিজকে রক্ষা করাও মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। তবে মনে রেখো, তোমাদের বা তোমাদের পুণ্যকর্মের আদৌ কোন প্রয়োজন তোমাদের খোদার নেই। **লাও লা দোয়াউকুম** হ্যাঁ যদি তোমরা সত্য-সত্যই তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাক আর তাঁর অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম কর তবে নিজেরা দোয়ার দ্বারা তাঁর অনুগ্রহ যাচনা কর। যখন তোমরা দোয়ার দ্বারা তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করে নিবে কেবলমাত্র তখনই তোমাদের কৃত কর্ম তোমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। আবার দোয়াও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি যাচনা করার পরও তা গৃহীত হওয়ার বিষয়টি অর্জিত না হয়। দোয়া গৃহীত হওয়াটাও আল্লাহ্ তা'লারই আশিসপূর্ণ অনুগ্রহ ও কৃপার মুখাপেক্ষী। আর এর জন্যও দোয়াতে রত থাকতে হয়। তাই সর্বক্ষণ দোয়াতেই রত থাকা উচিত। হে খোদা! আমরা কিছু করি আর না-ই করি আমাদের কৃত আমলে সালেহ গ্রহণ করতে আমরা যেসব দোয়া করে থাকি সেসব তোমার কাছে

কেবল তখনই গ্রহণীয় হতে পারে, যদি তুমি আমাদের দোয়াসমূহ অনুগ্রহের সাথে গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নাও। অতএব, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য পুনরায় দোয়াই করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, খোদার তোমাদের কোনই প্রয়োজন নাই, তিনি তোমাদের আমলের কোন ধার ধারেন না, তোমাদের কুরবানীসমূহের তাঁর কোন প্রয়োজন নাই, যে সব সদকা খয়রাত তোমরা তাঁর পথে দিয়ে থাকো সেসবের তাঁর কী প্রয়োজন! তাঁর ভান্ডার কী শূন্য হয়ে গেছে যে তোমাদের অর্থ-কড়ির তাঁর প্রয়োজন পড়েছে!! তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহ পালন করছ তোমরা তাঁর পথে যথেষ্ট পরিমাণে সাধ্য-সাধনা করছ ও প্রচেষ্টা চালাচ্ছো তা সত্ত্বেও তোমাদের কোন প্রয়োজন তাঁর নাই। তোমাদের যাবতীয় এসব কর্মের প্রতিফল কেবলমাত্র তখনই তোমরা লাভ করতে পার যখন দোয়ার মাধ্যমে যাচনা করে তোমরা তাঁর আশিসময় কল্যাণ ও অনুগ্রহ অর্জনে সক্ষম হবে। যখন **রহীমীয়্যতের** গুণাবলী বিকশিত হয়ে এর সাথে **রাহমানীয়্যতের** জ্যোতির্ময় বিকাশের সম্মিলন ঘটবে তখন তোমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাটুকু সপ্তম আকাশ পর্যন্ত তোমাদের উন্নীত করতে পারে। কিন্তু যদি তোমরা ভেবে থাক যে তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া তোমরা প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে তবে তোমরা ভ্রমে নিপতিত রয়েছ। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে **তাহ্তাছ্ ছারা** (সূরা ত্বোয়াহা) পর্যন্ত তোমরা হয়তো পৌঁছতে পার, শয়তানের কব্জায় তোমরা যেতে পার কিন্তু রহমান খোদার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করতে হলে তাঁর আশিসপূর্ণ অনুগ্রহ ছাড়া কেউ-ই তা পেতে পারে না। **ফাকাদ কাজ্জাবতুম** তোমরা এ বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাও। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দৃশ্যতঃ খুবই ধর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু। কিন্তু তারা নিজেদের আমলের ব্যাপারে, দোয়ার ব্যাপারে, রাত জেগে ইবাদত করার জন্য, দুনিয়াবাসীর যেসব সেবা তারা করে থাকে তার জন্য অহংকার করে। খোদা তা'লার তাদের কোনই প্রয়োজন নাই, যতক্ষণ তারা যাবতীয় শর্তাদি সহকারে দোয়া না করছে আর তাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করে **রাহমানীয়্যত**-এর গুণাবলীতে উদ্বেলিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাদের আমলসমূহকে কবুল না করছেন।

ফাসাওফা ইয়া কুনু লিজামা তোমাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কুপ্রচেষ্টার পরিণাম তোমাদের সাথে সাথেই থাকবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখ! আজকাল মুসলমানদের কোন কোন ফের্কার মধ্যে অনেক-অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তিরা রয়েছেন

কিন্তু তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাসমূহের ফলাফল কী তাদের সত্যতার সপক্ষে দৃশ্যমান হচ্ছে? আমরা যতদূর দেখেছি ও বুঝেছি, প্রকাশিত সে ফলাফলগুলো তেমনটি নয় যেমনটি একজন খোদাভীরু ব্যক্তির আমল থেকে হয় বরং তার হাজার ভাগের এক ভাগ আমল থেকে যতটুকু ফল লাভ হয় তা-ও নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে উল্লেখ করেছেন,

> প্রকৃতপক্ষে দোয়া করার জন্য এ দু'টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও ধ্যান নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক–
>
> **প্রথমত:** কল্পনা ও ধ্যান হবে এই যে, খোদাতাআলা প্রত্যেককে প্রতিপালন করতে, প্রবৃদ্ধি ঘটাতে, কল্যাণ সাধনে ও প্রতিদান দিতে পুরোপুরি সক্ষম আর সর্বশক্তিমানও। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ তাঁর এই মহান গুণটি সর্বদাই ক্রিয়াশীল থেকে নিজ কর্মের প্রকাশ ঘটিয়ে চলছে।
>
> **দ্বিতীয়ত:** এ বিষয়ের প্রতি, দৃষ্টি ও ধ্যান নিবদ্ধ রাখতে হবে যে, ঐশী সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া মানুষ কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না। আর নিঃসন্দেহে এ দু'টি বিষয় এমন যে দোয়ারত থাকা অবস্থায় যখন তা অন্তরে অটল ও গভীরভাবে রেখাপাত করে তখন স্বভাবতঃই মানুষের অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেয় যে এক আত্মম্ভর ও অহংকারীও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরও অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। এই হল বিশেষত্ব, যার কারণে নিথর এক মৃতের মাঝে জীবনের সঞ্চার ঘটে। গুরুত্ববহ এ দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রতিটি মানব-হৃদয়কে দোয়া করার দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে যে, এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক মাধ্যম যার দ্বারা মানব-আত্মা **রুহুস সুজুদ** হয়ে ওঠে আর নিজের দুর্বলতা ও বৃথা আস্ফালনকে উপলব্ধি করে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। এর মাধ্যমে মানুষ আত্মহারা হয়ে এমন এক জগতে প্রবেশ করে যেখানে নিজ অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না কেবল প্রতাপান্বিত মহান সত্ত্বার বিকাশ উজ্জ্বলতার সাথে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই পবিত্র সত্ত্বা কৃপার ভান্ডার, অস্তিত্ববান প্রতিটি অবয়বে, সকল মায়া মমতার মূলে ও প্রত্যেক কল্যাণের নিগঢ়ে দৃশ্যমান হোন। পরিশেষে তা **ফানাফিল্লাহ্**

(আল্লাহতে বিলীন) এর রূপ পরিগ্রহ করে! পরিগৃহীত এরূপ লাভ করার ফলে মানবের অস্তিত্ব সৃষ্টদের মাঝে ঝুঁকে থাকে না বা আপন সত্ত্বাতেও অবস্থান করে না, নিজস্ব ইচ্ছা ও অভিলাষ পূরণ করতে মগ্ন থাকে না বরং পরিপূর্ণরূপে খোদার প্রেমে আত্মহারা হয়ে যায়। পরিপূর্ণভাবে অস্তিত্ববান ওই প্রকৃত পরম সত্ত্বার এহলো সেই স্তর– 'শুহুদ' যে স্তরে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক উন্নতির তত্ত্ব-জ্ঞানে মগ্ন হয়ে সাধকের নিজের ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করার বিষয়টি উপলব্ধিতে আসে" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭২ থেকে ৫৭৪, টীকা নং ১১, প্রথম সংস্করণ)।

আঠারতম উদ্দেশ্য জানানো হয়েছে এটা যে, পবিত্র কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের ফলে পরিপূর্ণরূপে শ্রবণকারী খোদার নিগূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব-জ্ঞান দুনিয়া জেনে যাবে। এমন এক উম্মতের উদ্ভব এখানে ঘটানো হবে যারা দোয়া শ্রবণকারী খোদার সাথে জগতের পরিচয় ঘটিয়ে দেবে। এতে জগত ওই বাস্তবতার যথার্থতাকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়াতে নিমগ্ন থাকে যারা, তারাই আল্লাহ্ তা'লার **সামিউন** গুণের বিকাশ দর্শন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা 'সূরা মুমে'ন'এ উল্লেখ করেছেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝۶۱

ওয়া ক্বালা রাব্বুকুমুদ্উনী আস্তাজিব লাকুম্; ইন্নাল লাযীনা ইয়াস্তাক্‌বিরূনা আ'নৃই'বাদাতী সাইয়াদ্‌খুলুনা জাহান্নামা দাখিলীন্ (সূরাতুল মুমিন : ৬১)।

অর্থাৎ তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালক বলেন যে আমাকে ডাকো আমি তোমাদের দোয়া শুনব; কিন্তু ওই ব্যক্তিরা যারা অহঙ্কার করে আমার প্রকৃত ইবাদত করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অর্থাৎ এমন ইবাদত থেকে যা আমি কবুল করে থাকি আর সে প্রসঙ্গে আমি কুরআন করীমের অন্যত্রও উল্লেখ করেছি। সেই ইবাদতের সাথে সাথে তোমাদের একনিষ্ঠ ভাবে দোয়ায় নিমগ্ন হওয়াটাও জরুরী, আর যে সব লোকেরা অহঙ্কারের সাথে নিজেদের ইবাদতকে আজ্ঞাবাহিতার-দাসত্বের ওই স্তর পর্যন্ত না নিয়ে যাবে, আমি তাদেরকে নরকের শাস্তিতে নিপতিত করব।

অকৃতকার্য হয়ে তারা আমার ক্রোধ ও শাস্তির নরকে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝١٨٦

ওয়া ইযা সাআলাকা ই'বাদী আ'ন্নী ফা ইন্নী ক্বারীব উজ্বীবু দাওয়াতাদ্ দাই' ইযা দা'আনি ফাল ইয়াস্ তাজ্বিবূলী ওয়াল ইয়ূ'মিনূবী লা আ'ল্ লাহুম ইয়ার শুদূন (সূরাতুল বাকারা : ১৮৭) অর্থাৎ হে রসূল (স.), যদি আমার বান্দা আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'লার অস্তিত্বের কী প্রমাণ রয়েছে? তাঁর গুণাবলী সম্পর্কেই বা আমরা কী করে জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাহলে প্রত্যুত্তরে তাদের তুমি বলে দাও, 'খোদা তোমাদের নিকটেই আছেন। তোমরা তার দরজার কড়া নাড়াও তোমাদের জন্যে তা খুলে দেয়া হবে। তোমরা তার সমীপে দোয়া কর (তার নির্দেশিত শর্তাদি অনুযায়ী) তোমাদের দোয়া কবুল হবে'। দোয়া কবুল হওয়ার প্রেক্ষিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার মহানুভব সত্ত্বা ও তাঁর মহীয়ান গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশী-দর্শন লাভ করার পর তোমাদের হৃদয়-অন্তর তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে যাবে। এতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের উচিত **ওয়াল্ ইয়ু'মিনূবী** অর্থাৎ আমার প্রতি ঈমান আনো– ঈমান আনো আমার সত্ত্বায়, আমার গুণাবলীতেও। আর এতে করে তারা হেদায়াত লাভ করবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাকাতুদ দোয়া পুস্তকে বলেন,

> 'আর দোয়ার তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য' হলো এই যে, বিশ্বস্ত এক বান্দা ও তার প্রভূ-প্রতিপালকের মাঝে বিদ্যমান অভিনব এক সম্পর্ক হলো দোয়া। প্রথমে খোদা তা'লার অযাচিত করুণা (রহমানীয়্যত) বান্দাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। পরবর্তীতে বান্দার নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টার কারণে খোদাতাআলা তার নিকটবর্তী হয়ে যান আর দোয়ারত অবস্থায় ওই সম্পর্ক এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ অভিনবত্ব সৃষ্টি করে।
>
> অতএব,বান্দা যখন কঠিন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে পূর্ণ প্রত্যাশা নিয়ে, গভীর ও নিবিড় প্রেমে সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে খোদা তা'লার মুখাপেক্ষী হয়ে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায়

নিজ দুর্বলতার পর্দা ছিন্ন করে বিলীনতার প্রান্তে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে আর সম্মুখপানে গিয়ে সে **বারগাহে উলুহিয়্যত** খোদার বিচার সভা দর্শন করে, যেখানে তাঁর কোনই অংশীদার নেই। ওই আস্তানায় যখন সে নিজ মস্তক সমর্পণ করে দেয় আর 'আকর্ষণ বল' (**কুওতে জযব**) যা তার মাঝে সুপ্ত রাখা ছিল তা খোদা তা'লার অনুগ্রহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে তখন মহিমান্বিত আল্লাহ্ সমস্যা নিরসনে সদয় দৃষ্টি দেন। এভাবে ওই দোয়া যাবতীয় অনুসঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যা থেকে এমন সব উপায়-উপকরণ ও পন্থার উদ্ভব ঘটে যা ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় (বারাকাতুদ্দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

উনিশতম উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে এই যে, কেবল শ্রবণকারীর (**সামীউন**) গুণই নয় আল্লাহ্ তা'লার পরম জ্ঞান রাখা (**আলীমুন**) গুণটির বিকাশও জগদ্বাসী এই উম্মতের মাধ্যমে দেখবে। কোন কোন দোয়া নিষ্ফল হয়ে যাওয়া আবার কোন কোন দোয়া হুবহু সেই ভাবে পূরণ না হওয়া যেভাবে তা চাওয়া হয়েছিল, এতে সাব্যস্ত হয় না যে আমাদের মহিমান্বিত খোদা যথার্থ ও পরিপূর্ণরূপে শ্রবণকারী নন বা যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য ও ক্ষমতার মালিক নন বরং শ্রবণ করার বেলায় তিনি যেমনটা সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী, জ্ঞানের বেলাতেও তেমনই। তাই দোয়া গৃহীত হওয়াটা তাঁর পরম জ্ঞান রাখা (সিফতে আলীম) গুণটির সাথে সুগভীর সম্পর্ক রাখে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'আর এটা স্মরণে থাকা উচিত যে, দোয়া করতে কেবল মনোনিবেশ করাটাই যথেষ্ট নয় বরং ধর্ম-ভীরুতা ও পবিত্রতা, অকপট সরলতা ও দৃঢ়বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও নিবিড় একাগ্রতাও আবশ্যক। যে কেউ কোন বিষয় নিজের জন্য যাচনা করুক বা অন্যের জন্য, হোক তা ইহজগতের উদ্দেশ্যে বা পরকালের জন্য, দোয়ায় কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি অর্জিত হওয়া যেন ঐশী প্রজ্ঞা ও ঐশী সন্তুষ্টির বিপরীত না হয়। কখনও কখনও দোয়া–সংশ্লিষ্ট সব শর্ত পূর্ণ হয়ে গেলেও যা যাচনা করা হচ্ছে তা আল্লাহ্র কাছে যাচনাকারীর জন্য ঐশী প্রজ্ঞা ও ঐশী-সন্তুষ্টির বিপরীত হয়ে থাকে। এজন্য যাচনা অনুযায়ী ওই দোয়া পূর্ণ করাতে মঙ্গল হয় না' (বারাকাতুদ্দোয়া, পৃষ্ঠা ১০)।

এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তসমূহের উল্লেখ করেছেন যেমন– খোদাভীরুতা, পবিত্রতা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ ভক্তি ও ভালোবাসা ইত্যাদি, এসব শর্ত সেই দোয়াগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব দোয়া পছন্দনীয়। কিন্তু যে দোয়া কবুল হওয়াটা যাচাইয়ের জন্য বা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট, সেটার সাথে এসব শর্তের সম্পর্ক নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বিধান্বিত এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পতিতাদেরও আল্লাহ্ তা'লা সত্য স্বপ্ন দেখিয়ে থাকেন যাতে তারা হেদায়াতের পথ খুঁজে পায়, তাদের অন্তরে এমন ধারণার উদ্রেক হয় যে এই নোংরা জীবন থেকে বের হয়ে এসে পবিত্রতার উৎস ও প্রস্রবণ ধারার দিকে ছুটে চলে আসে, আর নিজ সত্ত্বাকে পাক-পবিত্র করতে প্রয়াসী হয়– প্রচেষ্টা চালায়। তবে দোয়াকারীর হৃদয় যদি খোদাভীরুতার জ্যোতিতে জ্যোতির্মান না হয় অথবা তার অন্তর সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতাপূর্ণ না হয় বা তার রসনা সুবাচনভঙ্গি অবলম্বনকারী না হয় অথবা তার অন্তর বিশ্বাসে ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ না হয়, তার বুদ্ধি ও মেধা বোধ ও চিন্তা-চেতনা গভীর মনোনিবেশের সাথে নিজ প্রভূ প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত না হয়, যা যাচনা করা হচ্ছে তা অদৃশ্য ও ভবিষ্যতদ্রষ্টার দৃষ্টিতে ওই ব্যক্তির যার জন্য তা যাচনা করা হচ্ছে মঙ্গলজনক না হয়, তবে এ সব অবস্থার সমস্ত দোয়াই প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে। তবে এরপরও আল্লাহ্ তা'লা ভিন্ন আঙ্গিকে এমন দোয়ারও বিনিময় দান করে থাকেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমন উল্লেখ করেছেন,

> এটা কী প্রত্যয়দানকারী দলিল-প্রমাণ নয় যে, আদিকাল থেকে আধ্যাত্মিক জগতে খোদা তা'লার অলৌকিক একই বিধান চলে আসছে। দোয়ার ফলে মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুপম গুণাবলীসমূহের একমাত্র আধার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আর এ থেকে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ হয়। যদি আমরা জীবনের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে ভ্রমে না পড়ি তবে সে উদ্দেশ্য লাভ হয়েই থাকে। আর যদি আমরা অবুঝ ওই শিশুর মত নিজ মায়ের কাছে সাপ বা জ্বলন্ত কয়লার টুকরা চাইতে থাকি, নিজের দোয়ায় বা যাচনায় ভুলের মধ্যে পড়ে থাকি, তথাপি খোদাতাআলা সে জিনিসই প্রদান করেন, আমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক ও উত্তম। এমনই দু'ভাবে তিঁনি ঈমানে আমাদের উন্নতি দান করেন। কেননা, আমরা বিপদকালে- আমাদের ক্রান্তিলগ্নে দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লা থেকে জ্ঞান লাভ করি আর এতে আমাদের

বিশ্বাসে দৃঢ়তা এতটা বৃদ্ধি পেয়ে যায় যে আমরা নিজ খোদাকে যেন চাক্ষুষ দর্শন করছি। দোয়া এবং তা শোনানো ও গ্রহণ করানোর এক অমোঘ ধারা সূচনা কাল থেকে– যখন থেকে মানবের সৃষ্টি, একইভাবে চলে আসছে। খোদা তা'লার ইচ্ছা যখন কোন কিছু করতে স্থির করে তখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম এই যে তাঁর কোন একনিষ্ঠ বান্দা সকাতরে ইনিয়ে বিনিয়ে নাছোড়বান্দার মত অস্থিরতা ও চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে দোয়ায় মগ্ন হয়ে যায়। সব শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষ করে ওই ঘটনা বা বিষয় সংঘটিত হওয়ার জন্য নিজকে নিমগ্ন করে রাখে। খোদাতে বিলীনপ্রাপ্ত ওই মহাপুরুষের দোয়া স্বর্গ থেকে ঐশী-কল্যাণকে আকর্ষণ করে, ফলে খোদা তা'লা নতুন নতুন এমন সব উপায় ও উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যাতে কাজ সমাধা হয়ে যায় (আইয়্যামুস সুলাহ, পৃষ্ঠা-১০)।

পবিত্র কুরআন করীমে দোয়া সম্পর্কে তিনটি মৌলিক বিষয় আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

প্রথমত– যতক্ষণ আমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণ আকর্ষণ না করছি ততক্ষণ নিজেদের আমলের কারণে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি না, নিশ্চিত হতে পারি না যে আল্লাহ্ তাআলা ওসব কবুল করবেন কী করবেন না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পরিস্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন **কুল মা ইয়াঅ্ বাউবেকুম রাব্বি লাও লা দোয়াউকুম** আমার প্রভু প্রতিপালকের তোমাদের কী-বা প্রয়োজন, তোমাদের নেকীরই বা-কী প্রয়োজন তাঁর বা তোমাদের আমলের, যদি দোয়ার সাথে সাথে তোমরা বিনয়াবনতই না হলে! কিন্তু আমরাতো তাঁর মুখাপেক্ষী। আমরা যদি চাই যে তিঁনি আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতা পূর্ণ জ্যোতির্বিকাশ ঘটাতে থাকুন তবে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে আমরা দোয়ার দ্বারা, এরূপ দোয়া যাতে দোয়ার সব শর্তই পূর্ণ করা হয়েছে এমন দোয়ার মাধ্যমে তাঁর আশিস ও কল্যাণ আকর্ষণকারী হই। যদি আমরা তদ্রুপ না করি, তবে আমাদের আমলের, কর্মপ্রচেষ্টার এতটুকু মূল্যও নেই জাগতিক দৃষ্টিতে যতটা মূল্য রয়েছে কীট-পতঙ্গের একটি পায়ের।

দ্বিতীয়ত– আল্লাহ্ তাআলা জানিয়েছেন যে, ইসলাম আমাদেরকে এমন শিক্ষা প্রদান করেছে যে যদি আমরা সেসব শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইসলামে প্রদত্ত

দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করি তাহলে আমরা আশা পোষণ করতে পারি যে আমাদের খোদা যিঁনি **সামী** তিনি আমাদের দোয়া শুনবেন ও তা কবুল করে আমাদের জন্য নিজ অনুগ্রহের– নিজ রহমতের উপকরণ সৃষ্টি করবেন।

আর তৃতীয়ত– আমাদের এটা জানিয়েছেন যে খোদা তা'লা সন্দেহাতীত ভাবেই **আস্ সামী** তবে তিনি **আলীম**ও। কোন ব্যক্তি জগদ্বাসীকে ধোকা দিতে পারে। দৃশ্যতঃ সে ধার্মিকতার পোশাক-আলখেল্লা পরিধান করতে পারে, হাজারো লৌকিকতার মধ্য দিয়ে সে নিজ ধার্মিকতা প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু সে তার নিজের প্রভুপ্রতিপালককে কখনই ধোঁকা দিতে পারে না। অতএব সে ব্যক্তিই খোদার কাছে গ্রহণীয় ও তারই দোয়া কবুল করা হয়ে থাকে, যার হৃদয়ে কোন প্রকারের বক্রতা ও কলুষতা বা অপবিত্রতা না থাকে, অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা, অহংবোধ, নিজকে কেউকেটা ভাবা অর্থাৎ নিজেকে কিছু একটা ভেবে নেয়া, এমনটি যেন না হয় বরং খোদা তা'লার প্রকৃত প্রেম দ্বারা পাপের মর্মজ্বালায় পাপের অনুতাপে সে ব্যক্তির যাবতীয় দূর্বলতা ও পাপসমূহ দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। এভাবে পাক-পবিত্র অন্তর ও নির্মল বক্ষে অশ্রুবাহী নয়নে নিজ প্রভুপ্রতিপালকের দরবারে বিনয়াবনত হয়ে উপস্থিত হলে পর, তার দোয়া কবুল করা হয়ে থাকে।

তবে আমাদের খোদা (নাউযুবিল্লাহ্) অজ্ঞ নন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। কুরআন করীমে যেমন বলা হয়েছে, তিঁনি বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখা কথাও জানেন। যুক্তির সাথে কুরআন করীমে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে– কে মুত্তাকী (খোদাভীরু) আর কে নয় তা-ও তিনি জানেন। তিঁনি এ-ও জানেন যে কে আমাদের শত্রু কে বন্ধু। তিঁনিই জানেন কীসে আমাদের মঙ্গল আর কীসে আমাদের ক্ষতি। তাই আমাদের দোয়াসমূহ **পরম জ্ঞান রাখা** (আলীম) গুণ-এর মালিক এর মর্যাদা নিয়েই তিঁনি কুবল করে থাকেন। তিঁনি (নাউযুবিল্লাহ্) নির্বোধ ঐ মায়ের মত নন, যে নিজের শিশু-সন্তান জ্বলন্ত কয়লার টুকরার আব্দার করলে দাউ দাউ করে জ্বলছে এমন কয়লার টুকরা কখনও কখনও তার সামনে রেখে দেন আর শিশু তাতে হাত পুড়িয়ে ফেলে। তিঁনি মায়ের চেয়েও অধিক মমতাবান। তিঁনি পিতার চেয়েও বেশী স্নেহ-পরায়ণ। তিনি দোয়া কবুল করবেন বলে যখন স্থির করেন তখন দোয়া এমনভাবেই কবুল করেন যেভাবে কবুল করলে আমাদের কল্যাণ হয়। কিন্তু দোয়াতে যা চাওয়া হয় তা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক না হলে তিনি নিজ থেকে তা প্রত্যাখ্যান করেন

আর তার পরিবর্তে কেবল নিজের অনুগ্রহে ও কৃপায় ভিন্ন কোন ভাবে ভিন্ন আকারে নিজ করুণা প্রদর্শন করেন। তিনি বড় বেশী মমতাকারী, তিনি খুবই স্নেহশীল প্রতিপালক। আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি আর জামা'তের অভ্যন্তরে ঐকমত্য ও একতা সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখি। এ বাস্তবতাকে কখনও যেন অবমূল্যায়ণ করা না হয় যে সর্বস্তরের ধার্মিকতা, **বেলাইয়্যাত**-এর সব স্তর খেলাফতে রাশেদার পদতলে অবস্থিত। যে ব্যক্তি নিজ সত্ত্বাকে কিছু একটা ভেবে নেয় তার দোয়া যদি কবুলও হয় তবে তা পসন্দনীয় বা মনোনীত হওয়ার কারণে নয়; ওই গ্রহণীয় হওয়াটা পরীক্ষা ও দুর্যোগ বিশেষ। তাই, সর্বদা নিজ প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি ভয় রেখে জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম
এর মাধ্যমে

উম্মতে মুসলেমা প্রতিষ্ঠিত

জুমুআর খুৎবা
৯ জুন ১৯৬৭

মসজিদ মুবারাক

রাবওয়া

প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আগমণকারী **হাদীয়ে আলাম**– বিশ্ব জগতের পথ প্রদর্শক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তির কারণে জগতের জাতিসমূহের মাঝে বিদ্যমান স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণের অধিকারী আত্মাগুলো প্রকৃতই ‘উম্মতে মুসলেমা’-য় পরিণত হয়ে যাবে। রাসূল (স.)-এর সম্বোধিতদের মধ্যে প্রথম রয়েছে আরবীয়রা, তাদের সব দোষ ত্রুটি অপবিত্রতা ধূয়ে মুছে পরিষ্কার করা হবে। এভাবে তারা পাক পবিত্র হয়ে আঁ হযরত (স.)-এর শাফায়াতের ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে নিজেদের মহান স্রষ্টা ও আসল মালিকের দরবারে সমবেত হবে এবং জগতের ‘পথ-প্রদর্শক’ হয়ে রাসূল (স.)-এর উত্তম আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া ও এর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও পাওয়া যেত তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা নবী আকরাম (স.)-এর মাধ্যমে ‘এক উম্মতে মুসলেমা’ প্রতিষ্ঠা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহে.) নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ (সূরা বাকারা: ১২৯-১৩০) তেলাওয়াত করেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۳۰﴾

অতঃপর হুযূর (রাহে.) বলেন, পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের ১৯ (উনিশ) টি মহান উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। **বিশতম উদ্দেশ্য– ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল্ লাক**–এ বর্ণিত হয়েছে আর 'প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আগমণকারী **হাদীয়ে আলাম–** বিশ্ব জগতের পথ প্রদর্শক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তির কারণে জগতের জাতিসমূহের মাঝে বিদ্যমান স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণের অধিকারী আত্মাগুলো প্রকৃতই 'উম্মতে মুসলেমা'-য় পরিণত হয়ে যাবে। রাসূল (স.)-এর সম্বোধিতদের মধ্যে প্রথম রয়েছে আরবীয়রা, তাদের সব দোষক্রুটি অপবিত্রতা ধূয়ে মুছে পরিস্কার করা হবে। এভাবে তারা পাকপবিত্র হয়ে আঁ হযরত (স.)-এর শাফায়াতের ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে নিজেদের মহান স্রষ্টা ও আসল মালিকের দরবারে সমবেত হবে এবং জগতের 'পথ-প্রদর্শক' হয়ে রাসুল (স.)-এর উত্তম আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া ও এর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও পাওয়া যেত তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা নবী আকরাম (স.)-এর মাধ্যমে 'এক উম্মতে মুসলেমা' প্রতিষ্ঠিত করেন।

যেমনটি কুরআন করীমে সূরা হজ্জে (আয়াত : ৭৯) বর্ণিত হয়েছে:

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝۷۹

আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেন, তোমার যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সকল বোধ ও বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদ কর– সংগ্রাম কর। এ সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছাও তাঁর হক্বকে পুরা কর কেননা তিনি বাছাই করে তোমাদের মনোনীত করেছেন। তোমাদেরকে ধার্মিকতাপূর্ণ সম্মান দান করেছেন আর তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ ধর্ম-বিধান দিয়েছেন। তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেছেন। ওই নির্দেশাবলী অনুসরণের জন্য যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, উক্ত নির্দেশাবলীর সাথে তা-ও তোমাদের প্রদান করা হয়েছে। এজন্য উক্ত নির্দেশাবলী পালন করা তোমাদের জন্য কোন বোঝা নয়। তোমরা, হে পিতা ইব্রাহীমের বংশধরেরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে **'আল মুসলেমীন'** নাম দিয়েছেন, উম্মতে মুসলেমা আখ্যায়িত করেছেন। তোমাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থেও এ নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে আর কুরআন করীমও তোমাদেরকে উম্মাতাম মুসলিমা, 'আল মুসলেমীন' নামে স্মরণ করে থাকে। এ নাম প্রাপ্তি ওই দোয়া সমূহের জন্যই হয়েছে যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন। সেই কল্যাণকর ও কল্যাণকামী ও কল্যাণপ্রদায়ী রসূলের আবির্ভাবের সাথে দুনিয়াতে এক উম্মতে মুসলেমা প্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং তাঁর বংশধরেরাও উম্মতে মুসলেমায় অন্তর্ভুক্ত হোক। অতএব, পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ রয়েছে তার মধ্যে **ওয়া মিন যুররিয়্যাতি উম্মাতাম মুসলিমাতাল্ লাক**-এর দোয়াটি রয়েছে। কুরআন করীমের সূরা হজ্জের ওই আয়াত এ দাবী রাখছে যে, ওই দোয়া গৃহীত হয়েছে আর যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে সেসব পূর্ণ হওয়ার সময়ও এসে গেছে। আঁ হযরত (স.) আবির্ভূত হয়ে গেছেন আর উম্মতে মুসলেমাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এজন্য যে, মানুষের অভ্যন্তরের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক গুণাবলীতে, চিন্তা ও চেতনায়, বুদ্ধি ও বোধনে অভাবনীয়

যে সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে তা প্রকাশের যুগ এসে গেছে। এখন জগত দেখবে, মানুষ তার প্রভূ প্রতিপালকের রাস্তায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য কীভাবে ব্যয় করে! আর চিন্তা চেতনাকে উৎকর্ষের পরম মার্গে কীভাবে তারা পৌঁছায়!

ইসলামের অর্থ হল নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে উৎসর্গ করা, নিজের প্রভূ-প্রতিপালকের সামনে নিজের ঘাড় পেতে রাখা। নিজের সকল আশা আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে সকল ইচ্ছা ও চাওয়া-পাওয়া ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে খোদার ইচ্ছার অধীনে সন্তুষ্ট থাকতে সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকা অর্থাৎ নিজের বলে কিছুই যেন আর অবশিষ্ট না থাকে, সবকিছুই খোদাকে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর খোদা থেকে এক নব জীবন লাভ করে–এক **খায়রে উম্মত** রূপে ইহজগতে জীবন কাটায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

> 'ইসলাম'এর পরিভাষাগত অর্থ হল ও-ই, যা এ আয়াতে করীমায় ইশারা করা হয়েছে–
>
> بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۳﴾
>
> **বালা মান আস্লামা ওয়াজ্বহাহূ লিল্লাহি ওয়া হুওয়া মুহসিনুন্ ফালাহূ আজ্বরুহূ ইনদা রাব্বিহী ওয়ালা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানূন** (আল বাকারা : ১১৩) অর্থাৎ সে-ই মুসলমান যে খোদা তা'লার পথে নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়। অর্থাৎ সে নিজ সত্ত্বাকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিবেদন করে রাখে, তাঁর ইচ্ছার অনুসরণ করতে তাঁর সন্তুষ্টিকে অর্জন করতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। খোদা তা'লাকে লাভ করার জন্য সৎকাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নিজস্ব সকল শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে তাঁরই পথে নিয়োজিত করে রাখে। উদ্দেশ্য হলো– ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে আর কর্মের দিক থেকেও খোদা তা'লারই হয়ে যাওয়া। ধর্মবিশ্বাসের বেলায় এমন যে, সে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে বাস্তবিকভাবে এমন এক জিনিষ ভেবে নেয় যা খোদা তা'লাকে শনাক্ত করতে পারে, তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর প্রেম ও ভালোবাসা আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর কর্মের দিক থেকে এমন যে, শুধুই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রকৃত সৎকাজ যা প্রতিটি কর্মোদ্দীপনা ও কর্মশক্তির ব্যাপারে খোদা প্রদত্ত প্রত্যেক সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত, তা সাধন করতে সদা

তৎপর থাকে। কিন্তু এতই আনন্দে বিভোর হয়ে আগ্রহ ও বিনয়ের সাথে কর্ম সম্পাদন করতে থাকে যে, সে নিজের আনুগত্যের আয়নায় নিজের প্রকৃত মা'বুদের চেহারা দর্শন করতে থাকে (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮)।

একুশতম উদ্দেশ্য– আরিনা মানাসিকানা–তে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সেই প্রতিশ্রুত নবীর উপর এমন এক শরীয়ত অবতীর্ণ হবে যা মানব-প্রকৃতির সকল বাস্তবসম্মত চাহিদা পূরণকারী হবে, সকল চিন্তা চেতনা তা থেকে কল্যাণ লাভ করবে। কলুষমুক্ত প্রত্যেক স্বভাবজাত অবস্থা নিজ বৈশিষ্ট অনুসারে স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী তা থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে উপকৃত হবে। প্রত্যেক যুগের চাহিদা, প্রত্যেক জাতির চাহিদা, প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাচেতনা অনুযায়ী তার চাহিদা, এর শিক্ষায় এর নীতিমালায় বিদ্যমান থাকবে আর তা বহালও রইবে। আল মানাসেক, আল মানসাক ও আল মানসিক'-এর বহুবচন (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য)। এর অর্থ হল যুহদ ও ইবাদত। যুহদ অর্থাৎ ধার্মিকতা, সংসারের প্রতি উদাসীনতা, ইবাদত অর্থাৎ ভক্তি-উপাসনা অর্থাৎ ওই সব কাজ যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য করা হয়ে থাকে।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা এটা বলেন নি যে, 'আরিনাল মানাসিক' ইবাদতের পরিপূর্ণ পদ্ধতি আমাদের শেখাও বরং এটা বলেছেন যে আরিনা মানাসিকানা আমাদের অবস্থানুযায়ী ইবাদতের যে সঠিক পদ্ধতি রয়েছে তা আমাদের শেখাও। মনে রাখা দরকার যে, কেবল 'কুরআনী শরীয়ত'ই এমন, যেখানটায় এ ব্যবস্থা বিদ্যমান, পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিধানসমূহে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন উম্মতে মুসলেমার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল আর কুরআন করীমের শরীয়ত তাঁর (স.) প্রতি অবতীর্ণ হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম (আ.)-এর আরিনা মানাসিকানা-এর দোয়া কবুল হল। অতএব, আরিনা মানাসিকানা-তে এ দোয়া করা হয়েছিল যে হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক্ব আদায়ে ও বান্দার হক্ব পূরণে, স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের সামর্থ্য দান কর। কুরআন করীম এ কথার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি নির্দেশনার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যে দিকনির্দেশনা কুরআন করীম প্রদান করে তার যে আঙ্গিকটি স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রসূত হয় তদনুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন কর ও ব্যবস্থা নাও। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে,

কতিপয় ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে সাধ্য-সাধনা করতে গিয়ে নিজের চিন্তা-চেতনা ও সামর্থ্যের 'উর্ধ্ব সীমা' অতিক্রম করে ফেলে, দীর্ঘ দিন ধরে রোযা রাখে, নিদ্রা ও বিশ্রাম খুবই কম করে, এমন হয় যে তাদের শারিরীক অবস্থা সহনীয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এতে তাদের পরিণাম আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পরিবর্তে বরং তারা পাগলে পরিণত হয়। তাদের কারও কারও অনভিপ্রেত নানা রোগ দেখা দেয়, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পুষ্টিহীনতায় ভূগে, যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় এমনি আরো নানাবিধ রোগ ব্যাধি তাদের নিত্য সাথী হয়ে যায়।

এখানে এ দোয়া শেখানো হয়েছে যে **ওয়া আরিনা মানাসিকানা**–প্রত্যেক যুগের জাতিসমূহের জন্য, প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন যুগের ধারায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত ইবাদত (উপাসনা) আর হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্‌র উপাসনা) ও হুকুকুল ইবাদ (সৃষ্টির সেবা)-এর দাবী পূরণের সঠিক পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা আমাদের দাও যাতে আমরা সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে, দূর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা থেকে, পদস্খলন ও পথভ্রষ্টতা থেকে, ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে রক্ষা পেয়ে তোমার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হই।

আহসান-এর প্রতি অর্থাৎ যা উৎকৃষ্ট পন্থা তা কার্যকর করতে কুরআন করীম অত্যন্ত জোরালো ভাবে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন বলা হয়েছে

جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

জ্বাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসান্ (আন্ নাহ্‌ল : ১২৬) অন্যের সাথে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে তোমরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পার। তবে যেটা 'আহসান'-উৎকৃষ্ট পন্থা সেটাই অবলম্বন কর। একজন, যাকে ভালোবাসার সাথে বললে মানতে প্রস্তুত, তাকে তুমি ভয় প্রদর্শন করো না। এমন পরিস্থিতিও এসে যায় যে বিরুদ্ধবাদী ভাবে আমি ষড়যন্ত্র করে যদি তাকে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত করে দিতে পারতাম, তবে তার ক্ষতি হতো আর আমার লাভ হতো। ওই সময়ে একজন আহমদীর অবশ্য কর্তব্য, কুরআন করীম প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার মানদণ্ড সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা আর জ্বাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান-এ যে আহসান-উৎকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ করার আদেশ রয়েছে তা পালনকারী হওয়া, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধকতা বা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। কুরআন করীম প্রদত্ত বহুবিধ নির্দেশসমূহে আল্লাহ্ তা'লা এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কোন নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিবিধ পন্থা অবলম্বন

করা যেতে পারে তবে যেটা উৎকৃষ্ট পন্থা তা অবলম্বন কর। আল্লাহ্ তা'লা নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে–

وَاتَّبِعُوٓا اَحۡسَنَ مَآ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِيَكُمُ الۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَّاَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ ۝٥٥

ওয়াত্তাবিউ' আহসানা মা উনযিলা ইলাইকুম্ মির রাব্বিকুম (আয্ যুমার : ৫৬)। পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী বিধি ব্যবস্থা 'কুরআন করীম'-এ তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তোমাদের এ আদেশ করা হয়েছে যে ওয়াত্তাবিউ' আহসানা মা উনযিলা ইলাইকুম্ মির্ রাব্বিকুম (আয্ যুমার : ৫৬)। তোমাদের প্রভু প্রতিপালক যিনি তোমাদের প্রতিপালন করে চূড়ান্ত মার্গে উন্নীত করতে চান। নিজের ওই বিশেষ গুণের কারণেই তিঁনি এমন এক শরীয়ত (বিধিবিধান) অবতীর্ণ করেছেন যার বহুবিধ দিক ও দিগন্ত রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতি জাতি ও প্রত্যেক কাল ও মহাকালে **প্রতিপালন** বৈশিষ্টের দাবী এটাই যে, নানা দিক-ও দিগন্তে বিভিন্ন ধারায় আদেশ-নির্দেশসমূহ কার্যকর করার পন্থা এতে বিদ্যমান রয়েছে। এ শরীয়ত বা বিধি-বিধান পরমদাতা প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত, তাই কিয়ামতকাল পর্যন্ত এটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। যেটি উৎকৃষ্ট পন্থা সেটি তোমরা অবলম্বন কর আর পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিটি নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে তোমাদের বিবেচনায় সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট পন্থাটি তোমরা অবলম্বন কর যা যুগ ও সময় উপযোগী হয়। যার ফলে তোমাদের সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা আর চিন্তা-চেতনা ও মেধা পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা'লা অন্য এক আয়াতে নির্দেশ করেছেন–

فَبَشِّرۡ عِبَادِ ۝١٨ الَّذِيۡنَ يَسۡتَمِعُوۡنَ الۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُوۡنَ اَحۡسَنَهٗ

ফাবাশ্শিরু ইবাদিল্লাযীনা ইয়াসতামিউ'নাল ক্বাওলা ফা ইয়াত্তাবিউ'না আহসানাহ (আয্ যুমার, আয়াত : ১৮, ১৯) অর্থাৎ আমার এ বান্দাদের অনুগতদের মধ্যে যারা **আল্ ক্বাওল**– এ বর্ণিত উত্তম শরীয়ত– এই মঙ্গলজনক বিধি-বিধান মেনে চলে **ফাইয়াত্তাবিউনা আহসানাহ্** নির্দেশনায় যে আদেশাবলী তাকে দেয়া হয় ওর মধ্যে উৎকৃষ্টতমটির অনুবর্তিতা করে, তাদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও **উলাইকাল্লাযিনা হাদাহুমুল্লাহ** (আয্ যুমার : ১৯) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের হেদায়াতের পথ প্রদর্শনের উপকরণ যোগাবেন আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে এ লোকেরাই **উলুল আলবাব** (আয্ যুমার : ১৫) সাব্যস্ত হবে,

শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিপন্ন হবে। এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে উলুল আলবাবের (দূরদৃষ্টি প্রাপ্তদের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর জ্ঞান-বুদ্ধি এজন্য দিয়েছেন যে সে ইসলামের বিধিবদ্ধ নির্দেশাবলীর আয়ত্ত্বাধীনে তার জ্ঞান-বুদ্ধি পরিচালিত ও প্রয়োগ করবে। সে যেন নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগায় আর পরিবেশ পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রাখে। যেমন যদি কেউ কারও সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে তবে তার মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) অবস্থা নিরীক্ষণ করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যেন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমি এ কথা এভাবে বললে সম্বোধিত ব্যক্তির উপর আমার কথা প্রভাব বিস্তার করবে।

এখানে বিস্তারিতভাবে আল্লাহ্র এমন অনুগতদের জন্যই সুসংবাদ দান করা হয়েছে যারা কুরআন করীমের বিধি-বিধান মান্য করে কর্ম ও জীবন অতিবাহিত করে। সুসংবাদ ওইসব লোকদের জন্য নয় যারা কুরআন করীম তো শুনে কিন্তু নিজেদের বিচার-বুদ্ধি কাজে লাগায় না আর 'আহসান'-উত্তম পন্থার পরিবর্তে ভিন্ন কোন উপায় অবলম্বন করে। তাই এরূপ উপাসনাকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে হেদায়াতের–পথ প্রদর্শনের সুসংবাদ প্রদান করেন নি বা শুভ-পরিণাম লাভের সুসংবাদবহ বার্তাও দেন নি। এখানে এক অর্থ এটা হবে যে আমার ওইসব উপাসনাকারীরা যারা 'আল ক্বওল' শুনে থাকে আর তা থেকে 'আহসান' এর অনুবর্তিতা করতে থাকে তাদের শুভ-পরিণাম লাভ হবে, যারা তা করে না তাদের পরিণাম শুভ হবে না।

বাইশতম উদ্দেশ্য– তুব্ আলাইনা-তে বর্ণিত হয়েছে আর তাতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, শেষ 'শরীয়ত'-বিধিবিধান যা এখানে প্রেরিত হবে তার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক থাকবে **রাব্বি তাওয়াব** তওবা কবুলকারী রব–প্রত্যাবর্তনকারীর প্রত্যাবর্তন গ্রহণকারী প্রভু-প্রতিপালকের সাথে। আর এর আজ্ঞাবহরা ও এর অনুসারীরা এ মৌলিক নীতির তাৎপর্য বুঝে যাবে যে তওবা ও ইস্তেগফার ব্যতীত মারেফতে ইলাহী-আধ্যত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশী সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব তাঁর পথে বারবার যেভাবে সে কুরবানী দিতে থাকবে তেমনিভাবে প্রতিনিয়ত ইস্তেগফারের মাধ্যমে তাঁর থেকে বর্ধিত শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতে থাকবে এবং তওবার সাথে সাথে তাঁর প্রতি বিনয়াবনতও হতে থাকবে। স্বীয় সাধ্য-সাধনা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে কখনই নিস্কলুষ ও নিরাপদ ভাববে না।

তাবাল্লাহু আলাইহি-এর অর্থ **তাওবাতুহু** এক উপাসনাকারী সৃষ্টি করলেন আর সে তওবা করলে তিঁনি তার তওবা কবুল করে নিলেন। এখানে এ দোয়া রয়েছে যে, 'ওয়া তুব্ আলাইনা' বলা হয়েছে, 'তওবা ও ইস্তেগফার'-এর অভ্যন্তরে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা যথার্থভাবে ও প্রকৃত অর্থে ওই উম্মতের জন্য প্রযোজ্য হবে আর তাদেরকে এমন এক শরীয়ত প্রদান করা হবে যা ওই বিষয়াদিকে (তওবা ও ইস্তেগফার) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে।

ধর্মীয় রীতিনীতি ও ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'তওবা'র চারটি ধাপ বা চারটি আঙ্গিক রয়েছে–

এক– পাপকর্ম পরিহার করা। যেমন–কারও মিথ্যা বলার অভ্যাস রয়েছে; অর্থাৎ সে এক পাপকর্মে লিপ্ত আছে। এমন অবস্থায় মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করার নাম তওবা। এ হল 'তওবা'র একটি আঙ্গিক বা স্তর।

দুই– পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জা জন্মানো এবং কোন এক অবস্থায় পাপকর্ম করা হলে তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি সব সময়ই মিথ্যা বলে না। যেমন– এক ব্যক্তি দীর্ঘ এক সময় মিথ্যা বলল না, ধরা যাক ছয় মাস সে কোনই মিথ্যা বলল না, তাহলে পাপ পরিত্যাগ (ওই ছয়মাস) তো হল কিন্তু তওবা নয় কেননা পাপ-কর্ম পরিত্যাগ করা ছাড়াও তওবাতে পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা ও পাপের কারণে অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যকীয়।

তিন– এ সংকল্পও গ্রহণ করা যে, আমি এ পাপকর্মে আর কখনই লিপ্ত হব না– অর্থাৎ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণের সাথে সাথেই পাপ পরিত্যাগকারী হয়ে যাওয়া এবং

চার– কোন কোন পাপকর্ম এমন হয়ে থাকে যার প্রতিকার বা সংশোধন সম্ভব। যেমন– কারও এক শত টাকা মেরে দেয়া হল– এ ক্ষেত্রে তওবার অর্থ কেবল এটুকুই নয় যে ভবিষ্যতে আর কারও টাকা-কড়ি মেরে দেয়া থেকে বিরত থাকা হবে। আবার অনুতাপ ও অনুশোচনার সাথে এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করা হলো যে আমি কখনও এমন পাপকর্মে আর লিপ্ত হব না কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ওই এক শত টাকা ফেরত দেয়া হল না যদিও সে এতটা গরীব নয় যে ওই একশত টাকা সে ফেরত দিতে পারছে না। এমন অবস্থাতে এটা তওবা নয়।

এ চার আঙ্গিকের প্রতিটি স্তরের দাবী পূর্ণ করার জন্য আবশ্যকীয় যে, আমরা যেন আমাদের স্রষ্টার কাছ থেকে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনে ব্রতী হই কেননা পাপকর্ম পরিত্যাগ করা খোদাতাআলা থেকে অর্জিত শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। পাপকর্মের প্রতি লজ্জা ও ঘৃণাবোধ জন্মানো তাঁর প্রদত্ত অনুকম্পা ব্যতিরেকে অসম্ভব। অবশিষ্ট রইল দৃঢ়সংকল্প। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ! তুচ্ছ এ মানুষের মধ্যে কি করে এ সাহস হতে পারে যে, সে এ দাবী করে বসবে যে আমি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার থেকে শক্তি সামর্থ্য লাভ করা ছাড়া এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি, এ দৃঢ় ইচ্ছা ধারণ করতে পারি যে 'ভবিষ্যতে কোনই পাপকর্ম করব না'। অতএব, এর জন্য খোদাতাআলা প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। আর সাধ্যে যতদূর কুলায় প্রতিকার ও সংশোধনে নিয়োজিত থাকা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা থেকে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করার আবশ্যকতা অপিরিহার্য।

আবশ্যকীয় এ শক্তি-সামর্থ্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। খোদার অনুগতরা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালক'কে সকল শক্তি ও সামর্থ্যের মূল উৎস ও প্রস্রবণধারা বলে জানে আর নিজেদের অভ্যন্তরে কোনই শক্তি ও সামর্থ্য খুঁজে পায় না বা প্রত্যক্ষও করে না। এ কারণে প্রতিটি কাজ করার পূর্বে তারা নিজেদের প্রভুর প্রতি বিনয়াবনত হয় আর ইস্তেগফার করতে থাকে সেই সাথে স্বীয় প্রভূর কাছে নিবেদন করে– হে খোদা! তুমিই সকল শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস, তাবৎ ক্ষমতার আঁকড়-আধার-ভান্ডার। তুমি আমাকে ওই সব শক্তি-সামর্থ্য ক্ষমতা ও মেধা দান কর যাতে আমি কুকর্ম ও মন্দসমূহ পরিত্যাগ করে সৎকর্মের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই। এ অর্থে প্রথমে ইস্তেগফারের অবস্থান আর পরবর্তীতে তওবা। ইস্তেগফার করা ব্যতিরেকে তওবায় প্রতিষ্ঠত থাকা সম্ভবই নয়। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

> "ইস্তেগফার ও তওবা দু'টি বিষয়। একদিক থেকে তওবার উপর 'ইস্তেগফার'-এর প্রাধান্য রয়েছে। কেননা, ইস্তেগফার হচ্ছে প্রতিবিধানকারী সহায়ক শক্তি যা খোদা তা'লা থেকে অর্জন করতে হয় আর তওবা হলো স্বীয় পদে দন্ডায়মান থাকা। ঐশী বিধান এই-ই যে, যখন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সাহায্য যাচনা করা হয় তখন

খোদাতাআলা এক বিশেষ শক্তি দান করেন আর সেই শক্তি লাভ করে মানুষ পরবর্তীতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, সৎকর্ম সাধন করতে নিজের মধ্যে এক প্রেরণাময় শক্তির উদ্ভব ঘটে, যার নাম **'তুব্ ইলাইহি'**। এরূপ নিয়ম চিকিৎসা পদ্ধতিতেও রয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের পথচারী **(সালেক)** এর জন্য ওতে এক উদ্দেশ্য নিহিত রাখা হয়েছে যে ওই পথে পরিভ্রমণকারী সর্বাবস্থায় খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করুক। আধ্যাত্মিক জগতের পথচারী খোদাভক্ত (সালেক), যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা থেকে শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না করছে কী-বা সে করতে পারে! তাই ইস্তেগফারের পরেই তওবা করার সামর্থ্য মিলে। যদি ইস্তেগফারই করা না হয় তবে স্মরণ রেখো যে তওবার প্রাণশক্তি অবশ্যই নির্বাপিত হয়ে যায়। আর যদি এভাবে ইস্তেগফারে রত থাকো ও তওবা করো তবে পরিণাম হবে

يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

ইয়ুমাত্তি'উকুম মাতাআন হাসানান ইলা আজ্বালিম মুসাম্মা (হুদ : ৪) (অনুবাদ–তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করবেন)।

আল্লাহ্ তা'লার বিধানসমূহ এ রীতিতেই চলমান যে ইস্তেগফার ও তওবায় যদি রত থাকো তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। প্রত্যেকের জন্য এক সীমারেখা, এক এলাকা, এক ক্ষেত্র রয়েছে যাতে সে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রায় উন্নতি লাভ করতে পারে (মালফুযাত, ১ম খন্ড, আল হাকাম, ২৪ জুলাই ১৯০২, পৃষ্ঠা ১০)।

তিনি (আ.) বলেন, নিজ নিজ গণ্ডিতে অবস্থান করে যতটা তোমার পক্ষে করা সম্ভব আধ্যাত্মিকতায় ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকো আর তা লাভ করতে থাকো ইস্তেগফার ও তওবার মাধ্যমে।

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এ বিশদ বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে ইস্তেগফার করার, যাচনা করার প্রকৃত অর্থ এটাই যে– তা এজন্য করা হয় না যে, কোন অধিকার হরণ করা হয়েছে বরং এ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, কোন অধিকারই

যেন খর্ব না হয়, হৃত না হয়। মানব প্রকৃতি নিজেকে দুর্বল অবস্থায় দেখে এর প্রতিবিধানকল্পে খোদা তা'লার কাছে শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে শক্তি সামর্থ্য যাচনা করে... আর এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন করে যে মানুষ পবিত্রতার উচ্চ মার্গে ও মধ্যস্ততার উঁচু স্তরে তখনই পৌঁছাতে পারে যখন সে নিজের দূর্বলতা দূর করতে আর অন্যদেরকে পাপের বিষমুক্ত করতে প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্তে দোয়ারত থাকে ও অনুনয় বিনয় ও মিনতির সাথে খোদা তা'লা প্রদত্ত শক্তি আকর্ষণ করে নিজের দিকে টানতে থাকে আর কামনা করে যে এ শক্তি ও সামর্থ্যের অংশ অন্যরাও লাভ করুক, যাতে ঈমানের সাথে তাদের সংযোগ সাধিত হয়ে যায়। নিষ্পাপ মানুষের খোদা তা'লার কাছে শক্তি সামর্থ্য যাচনা করা এজন্য অতি আবশ্যক যে, মানব-প্রকৃতি তো নিজ সত্ত্বায় কোন সৌন্দর্য, কোন পূর্ণতাই ধারণ করে না বরং সর্বদা খোদা থেকে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা পেয়ে থাকে আর নিজ সত্ত্বায় কোন শক্তি ও সামর্থ্যও রাখে না বরং খোদা থেকেই শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে আবার নিজ সত্ত্বায় কোন আলোকময় দ্যুতি ও জ্যোতিও রাখে না বরং খোদা থেকেই তার উপর আলোকময় দ্যুতি নিপতিত হয়। এর প্রকৃত রহস্য এই যে **সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষী প্রকৃতি**-কে কেবল এক আকর্ষণ ও অনুরাগ প্রদান করা হয় যাতে সে **অনন্ত ও সীমাহীন সৌন্দর্যময় মহাশক্তি**কে নিজের দিকে টানতে, আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। যেহেতু পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যে সদা-বিদ্যমান ওই ভান্ডার থেকে ফিরিশ্‌তারাও শক্তি টেনে নেয়, আর অনুরূপভাবে **ইনসানে কামেলও** (পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব) শক্তির ওই মহা উৎস থেকে ইবাদতের–দাসত্বের নলপথ (**উবুদিয়ত কি নালী**) দিয়ে পবিত্র ও কল্যাণপূর্ণ শক্তি আকর্ষণ করে নিজের দিকে শুষে নেয়... অতএব দেখ ইস্তেগফার কী জিনিষ!

এ-ই হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তীতার ফল! যে পথে শক্তি নিঃসরিত হয়ে সঞ্চিত হয়। তৌহীদের– একত্ত্ববাদের গূঢ় রহস্য এ নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে, পবিত্র গুণাবলীকে মানুষের এক মহামূল্যবান অনন্য সম্পদ নির্ধারণ না করে বরং তা অর্জনের নিমিত্তে খোদাকেই মূল উৎস নির্ধারণ করা (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস উর্দূ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০)।

যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিরাপত্তা অর্জিত হয়, মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লা থেকে শক্তি ও ক্ষমতা পেয়ে যায় তখন সে তওবা করতে সক্ষম হয় আর তখন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে তার তওবা গৃহীত হয়।

এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

> অতএব দূর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়, আর তওবা কর। নিজ প্রভু ও মালিককে সৎকর্ম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে লেগে যাও। স্মরণ রেখো! ধর্মবিশ্বাসজনিত ভূল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির শাস্তি মৃত্যুর পরে হয়ে থাকে। হিন্দু বা খৃষ্টান না মুসলমান-এর সিদ্ধান্ত হবে কিয়ামত দিবসে। কিন্তু যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন ও পাপ কর্মে এবং নির্লজ্জতায় ও ছিদ্রান্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যায়, ওই অবস্থানে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। কোন ভাবেই সে খোদা প্রদত্ত শাস্তি থেকে পালাতে পারে না। অতএব নিজ খোদাকে শীঘ্র সন্তুষ্ট করো নচেৎ সেদিন সমাগত...। তোমরা খোদার সাথে আপোষ রফা করে ফেলো, সন্ধি করে নাও। তিনি বড়ই দয়াবান! এক মুহূর্তের বিনম্র তওবায় সত্তুর বছরের পাপ মোচন হয়ে যেতে পারে। আর এটা বলো না যে তওবা গৃহীত হয় না। মনে রেখো, তোমরা নিজেদের আমল দ্বারা- কৃত কাজ কর্ম দ্বারা কখনও বাঁচতে পারো না। সর্বদা তাঁরই অনুগ্রহ তোমাদের রক্ষা করে– কর্ম নয়। হে পরম দয়াময় ও বারবার কৃপাকারী খোদা! আমাদের সবার প্রতি করুণা কর যাতে আমরা তোমার দাস হয়ে তোমারই আস্তানায় পড়ে থাকতে পারি, আমীন! (লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৪৭)।

গরমের কারণে আজ আমার অস্বস্তি ছিল। আর এখানে মসজিদেও বেশ গরম লাগছে, বন্ধুদেরও দীর্ঘক্ষণ খুৎবা শুনতে কষ্ট হয়ে থাকবে। এ কারণে আজ এখানেই ক্ষান্ত করলাম। আর অবশিষ্টাংশ আল্লাহ্ তা'লার দেয়া সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁরই অনুগ্রহে আগামী খুতবায় বর্ণনা করব।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের যাবতীয় উদ্দেশ্য
রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম
এর
আবির্ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে

জুমুআর খুৎবা
১৬ জুন ১৯৬৭

মসজিদ মুবারাক
রাবওয়া

খোদা চান– আধ্যাত্মিক যে তত্ত্ব-দর্শনের সাথে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত নির্মাণের সম্পৃক্ততা রয়েছে, জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও যুবকেরা, পুরুষেরা ও নারীরাও ঐশী প্রজ্ঞাপূর্ণ সেই বিষয় বুঝে উঠুক, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছে **উলুল আলবাব-** অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। তারা যেন তাঁর আহ্বান, তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলী ও উক্ত নির্দেশাবলীর গূঢ় রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়ে যায় এবং ঐ পবিত্র অনুসারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার সর্বপ্রকার করুণা ও কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে।

তাশাহ্হুদ, তাউ'য ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহে.) বলেন–

গতকাল প্রায় সারা দিনই প্রচণ্ড মাথা ব্যথা ছিল। আমি এখনও যথেষ্ট দুর্বল বোধ করছি তথাপি আমি চাই, বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত তেইশটি (২৩) মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান শুরু করেছি তার চলমান ধারা বজায় রাখি। এতে শেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার বর্ণনা বাদ রয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে আজকের খুৎবায় নিজস্ব ধারণা ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করব।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾

বর্ণিত এ আয়াতে বলা হয়েছে যে এমন এক নবীকে এখানে আবির্ভূত করা হবে যিনি কেয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকবেন আর তাঁর নিজস্ব আশিস ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রবহমান ধারাকে মৃত্যু কখনও স্পর্শ করবে না, কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা জীবিত থাকবে। কালজয়ী জীবন তাঁকে দান করা হবে, এমন এক শরীয়ত তাঁকে দান করা হবে যা হবে কালোত্তীর্ণ, সর্বকাল-ব্যাপ্ত। কখনও সেটি বাতিল হবে না, কেননা সেটি হবে **আল কিতাব** পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতাদানকারী শরীয়ত-বিধান এবং এমন এক উম্মত সৃষ্টি করা হবে, যে উম্মত সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সুগভীর প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদেরকে হেকমত বুঝানো হবে, তাদেরকে যুক্তি-জ্ঞানে প্রসারতা দান করা হবে আর জিন্দা খোদা, জীবিত রসূল ও জীবন প্রদায়ী শরীয়তের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকবে।

এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবী করীম (স.)-এর আবির্ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে, যেমনটি– কুরআন করীম নিজেই সে দাবী উপস্থাপন করেছে। যার প্রতি আমি এখন আলোকপাত করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন,

> লক্ষ্য কর! **ইব্রাহীম (আ.)** এক দোয়া করেছিলেন, তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে আরবে এক নবীর উদ্ভব হোক। সে দোয়া কী তৎক্ষণাৎ কবুল হয়ে গিয়েছিল? ইব্রাহীম (আ.)-এর পর এক সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হলে কারও খেয়ালই রইল না যে ওই দোয়ার কী পরিণতি হল! কিন্তু রসূল করীম (স.)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ওই দোয়া পূর্ণ হল আর কতই না শান-শওকতের সাথে পূর্ণতা পেল (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৬; আল হাকাম, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮, ২৮, ফেব্রুয়ারী ১৯০৩)।

এ আয়াতে করীমা'য় পাঁচটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে–

প্রথম– পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী দাসের আবির্ভাব হওয়া।

দ্বিতীয়– সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর অকাট্য ও অকর্তিত ধারা প্রবহমান থাকা।

তৃতীয়– পূর্ণতাপ্রাপ্ত এক পরিপূর্ণ শরীয়তের প্রবর্তন ও কিয়ামতকাল পর্যন্ত সেই শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকা।

চতুর্থ– শরীয়ত প্রদত্ত নির্দেশসমূহের হেকমত বর্ণনা করা... এবং

পঞ্চম– এটি জানানো হয়েছে যে এর ফলশ্রুতিতে কেয়ামতকাল পর্যন্ত পবিত্রদের এক জামাত সৃষ্টি হওয়ার চলমান ধারা অব্যাহত থাকবে।

কুরআন করীমের বহু স্থানে এ দাবী করা হয়েছে যে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ওই দোয়ার ফলে নবী আকরাম (স.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এখন আমি সূরা নমলের কয়েকটি আয়াত বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٢﴾
وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا
مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٣﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

আমরা যখন এ বিষয়টি যা পুর্বোল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ **রাব্বানা ওয়াব আছ ফিহিম রাসূলাম মিনহুম** বিশ্লেষণ করি ও পূর্বাপর বিষয়গুলো সাজিয়ে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-দর্শন পর্যবেক্ষণ করি তখন এর এ অর্থই আমাদের বোধগম্যে আসে যে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামের দোয়া **'রাব্বানা ওয়াব আছ ফিহিম রাসূলাম মিনহুম'** এর তাৎপর্য হলো– হে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের প্রভু-প্রতিপালক যার কারণে তুমি নবরূপে কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণ করাচ্ছ আর তোমার পবিত্র গৃহের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা প্রদান করাচ্ছ, এ বায়তুল হারামে- পবিত্র নগরীতে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে, সেই 'মহান আত্মা'কে দন্ডায়মান কর, তাঁকে তোমার নিজের লালন-পালনে নাও, তাঁকে পবিত্র করে দাও আর তাঁকে তোমার পরম সান্নিধ্য দান কর আর পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত দিয়ে তোমার রসূল মনোনীত কর ও পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীর

মর্যাদায় উন্নীত করে তাঁকে জগতে প্রেরণ কর যাতে সে মানবজাতিকে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং নিরংকুশ তৌহীদের উপর তাদের প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্ তা'লা সেই দোয়া কবুল করলেন আর নবী করীম (স.)-এর কণ্ঠে জগতে এ ঘোষণা প্রদান করালেন যে–

ইন্নামা উমিরতু আন আ'বুদা রাব্বা
হাযিহীল বালদাতিল্লাযী হাররামাহা

হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালামের দোয়া কবুল হয়েছে আর আমাকে রাব্বুল আলামীন নির্দেশ করেছেন যে– আমি এ পবিত্র নগরীতে, সম্মানিত জনপদে (**বাল্‌দে হারামে**), এ বায়তুল্লাহ্‌র প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদতকে পরিপূর্ণতার মার্গে পৌঁছিয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী এক দাসরূপে প্রকাশিত হয়ে মানবজাতিকে আল্লাহ্– কা'বার প্রভু প্রতিপালক, সম্মানিত জনপদের (বালদে হারামের) প্রভূ প্রতিপালক-এর দিকে আহ্বান করি। ওই পবিত্র সত্তার প্রতি '**ওয়া লাহু কুল্লু শায়ইন**' যিনি মহাপরাক্রমশালী ও যাবতীয় সুন্দর নাম সমূহের অধিকারী। ওই মহান সত্তা যা চান তা-ই করেন, দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে বা তিষ্ঠিতে পারে না আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি 'আল মুসলিম'-এর গন্ডিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক মুসলিমের পরিপূর্ণ আদর্শ ও নমুনা জগতের সামনে উপস্থাপন করি। ওখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের মুখ থেকে যে দোয়া নিঃসৃত হয়েছে **রাব্বানা ওয়াবআছ ফিহিম রাসূলাম মিনহুম** তা কুরআন করীম সংরক্ষণ করেছে আর এখানে নবী আকরাম (স.)-এর কণ্ঠে দুনিয়া সমক্ষে এ ঘোষণা করানো হয়েছে যে– এ সম্মানিত জনপদের প্রভুর ইবাদত করতে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীমের দোয়ার ফল স্বরূপ আজ আমি দুনিয়ার হেদায়াতের জন্য, দুনিয়াকে পথ-প্রদর্শনের জন্য দন্ডায়মান হয়েছি।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থঃ যে সব বিষয়ের এখানে উল্লেখ রয়েছে তা '**ইয়াতলূ আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইয়ু আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা**'য় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এক পরিপূর্ণ দাসের আবির্ভাব হবে এবং পরিপূর্ণ দাসের আগমনের সাথে জগত অকাট্যভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহের চলমান ধারা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে। সে 'আল কিতাব' এর শিক্ষাদান করবে এবং যেসব নির্দেশসমূহ সে ওই পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী কিতাব থেকে বর্ণনা করবে, তার সাথে সাথে সে সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও তাদের অবহিত

করবে। লক্ষ্য কর–**'ওয়া আন্ আতলু ওয়াল কুরআন'** এর মধ্যে এ তিনটি বিষয়ই পাওয়া যায়। আয়াত বর্ণনা করা, কিতাব শেখানো ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-দর্শন বুঝাতে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে আয়াতের উপর আলোকপাত করা। এ তিনটি বিষয়ই ওই দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিল যা **'আন আতলু ওয়াল কুরআন'** এ পাওয়া যায়। কেননা কুরআন করীমের বাগধারায় তেলাওয়াত শব্দ দ্বারা আয়াত বর্ণনা করা ও তা শেখা, তা শেখানো ও তার প্রভাব গ্রহণ করা এবং সেই প্রভাব অনুযায়ী নিজ জীবন গড়া, এ সব গুলো অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কিতাব ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও তত্ত্ব দর্শন পাঠ করা, অপরকে পাঠ করে শুনানো ও এর উপর আমল করা বা তদনুযায়ী কর্ম করা এবং অন্যকেও অনুরূপ কর্ম করতে বলা এসব অর্থে **তেলাওয়াত** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মুফরাদাতে রাগিব (আরবী অভিধান) এ 'তেলাওয়াত'এর আভিধানিক অর্থ এই করা হয়েছে যে– **আত্ তিলাওয়াতু তাখতাস্সু বি ইত্তিবায়ি কুতুবিল্লাহিল মুনায্ যালাতি নারাতু বিল ক্বিরাআত ওয়া নারাতু বিল ইরতিসায়ি লিমা ফিহা মিন আমরিওঁ ওয়া নাহ্ ইয়ি তারগীবি ওয়া তারহীব** (মুফরাদাতে রাগিব, কিতাবুল লিকা যেরে তা'লা)।

অর্থাৎ তেলাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর তাৎপর্য যথাযথরূপে পালন করার জন্য এ কিতাবের অনুসরণ করা হোক যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ অনুসরণ দু'ভাবে হয়ে থাকে, উচ্চারণের সাথে পাঠ করা এবং প্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী কর্ম পালনকারী হয়ে আগ্রহের সাথে নির্দেশাবলী গ্রহণ করে এতে বর্ণিত করণীয় আদেশগুলো– অনুজ্ঞা এবং অকরণীয় নির্দেশগুলো– নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করা 'তেলাওয়াত'-এ অন্তর্ভুক্ত। উৎসাহিত হয়ে নিজ আগ্রহ বাড়িয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওই কিতাব যে প্রভাব সৃষ্টি করতে চায় ঐ প্রভাব গ্রহণ করে নেয়া অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাপূর্ণ আদেশ ও নিষেধাবলী বর্ণিত হয়েছে তার তত্ত্বদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অর্থও 'তেলাওয়াত' শব্দে নিহিত রয়েছে।

কুরআন করীমে সূরা আনফালে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَاِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُهٗ زَادَتۡهُمۡ اِيۡمَانًا

ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহূ যাদাত্হুম ঈমানান... (আনফাল : ৩)। অর্থাৎ মুমেন তারা, যখন তাদের উদ্দেশ্যে ঐশী নিদর্শনপূর্ণ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয় তখন কৃত অসংলগ্ন ক্রিয়া কর্মের জন্য তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সাবধানতা

অবলম্বন করে এবং নিজেদের ঈমানের ভিত্ ক্রমান্বয়ে গড়তে থাকে। এখানে আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে আয়াতের ব্যাপারেও 'তেলাওয়াত' শব্দ কুরআনের বাগধারায় ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে কিতাব পাঠ করা আর যা কিছু তাতে বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা আর জগতের সামনে নিজের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করার ব্যাপারেও তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেন–

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ

উত্‌লু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি... (সূরা আন কাবুত : ৪৬)। অর্থাৎ তোমার প্রভুর কিতাব থেকে যে ওহী তোমার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে (ওহী অবতরণের ধারা তখন চলমান ছিল) তা তেলাওয়াত কর অর্থাৎ সে অনুযায়ী কর্মপালন কর অর্থাৎ– সেই কাজে লেগে থাক এবং তা পাঠও করতে থাক। মানুষ যা কিছু নিজে পড়ে তা যেমন নিজের উপকারার্থে পড়ে তেমনি অন্যদের শোনানোর জন্যও পড়ে। যেহেতু এ নির্দেশের সম্বোধিত প্রথম ব্যক্তি হলেন নবী আকরাম (স.), এজন্য এর অর্থ এটা হবে যে, কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে জনগণের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হও। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের ব্যাপারে কুরআন করীম সর্বদা এ বর্ণনাই প্রদান করে যে তাদের প্রত্যেকের দাবী ও স্বকণ্ঠ ঘোষণা এ হয়ে থাকে যে, আমি **আওওয়ালুল মুসলিমীন** অর্থাৎ সর্বাগ্রে আমিই এ আদেশ ও নিষেধাবলী পালনকারী, আমি আমার ঘাড় খোদার হুকুমের নীচে পেতে রাখছি আর এরূপে তোমাদের জন্য নেতা হিসেবে এক নমুনা উপস্থাপন করছি। আমি একথা বলছি না যে এ পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় তোমরা এ পথে চলো, বরং আমি এ কথা বলি যে এ রাস্তা খোদার দিকে পৌঁছানোর রাস্তা। আমি এ পথ ধরে চলছি আমার পিছন পিছন আস যেন তোমরাও খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাও। অতএব আভিধানিক দৃষ্টিকোণে জ্ঞানতঃ ও কর্মে অনুসরণ ও অনুগমণ করা মুফরাদাতে রাগেব অনুযায়ী 'তেলাওয়াত'-এর অর্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জ্ঞানতঃ অনুসরণ করো– এ আদেশটিকে হেকমতের কথা প্রজ্ঞার বিষয় জেনো, আর কর্মে আজ্ঞানুবর্তী হও, এ নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের জীবন গড়। আল্লাহ্ তা'লা নবী আকরাম (স.)-এর মুখ দিয়ে সংক্ষেপে এ কথা নির্গত করিয়েছেন যে 'ওয়া আন্ আত্‌লু ওয়াল কুরআন' আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এ হুকুম রয়েছে যে, আমি এই কুরআন তোমাদের পাঠ করে

শুনাবো। কুরআন শব্দটি আয়াতের বেলাতেও কুরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে–

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ

বাল হুওয়া আয়াতুম্ বায়্যিনাতুন... (আন কাবুত : ৫০) অর্থাৎ এ আয়াত অকাট্য প্রামাণিক দলীল আর এজন্য 'আন্ আত্‌লুওয়াল কুরআন' এর অর্থ এই যে, আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীপূর্ণ অকাট্য রূপে প্রমাণিত আয়াতগুলো তোমাদের সামনে পাঠ করে শোনাই। এভাবে কুরআন করীমের এ দাবীও রয়েছে যে সে আয়াতগুলো পরিপূর্ণ শরীয়ত এজন্য 'আন আত্‌লুওয়াল কুরআন' এর অর্থ এও যে– খোদা আমাকে হুকুম দিয়েছেন, তোমাদের সামনে পরিপূর্ণ এ শরীয়ত কিতাব আকারেও আর 'আওওয়ালুল মুসলিমীন' এর অবয়বেও উপস্থাপন করি। কেননা যখন নবী করীম (স.)-এর আচার-ব্যবহার স্বভাব চরিত্রের বিষয় জিজ্ঞেস করা হল তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন তোমরা কুরআন পাঠ করে জেনে নাও (**কানা খুলুকুহু কুরআন**)।

আর ইব্রাহীম (আ.)-এর এ দোয়াওছিল– **'ইয়াত্‌লূ আলাইহিম আয়াতিকা'** সেই নবী সুস্পষ্ট নিদর্শনমূলক অকাট্য দলীল প্রমাণ জগতে উপস্থাপন করতে থাকবে আর নবী করীম (স.) বলেন যে সেই দোয়াটি গৃহীত হয়েছে। খোদা তা'লার নির্দেশে আমি 'আত্‌লু ওয়াল কুরআন'–কুরআন করীমের স্পষ্ট নিদর্শনমূলক অকাট্য দলীলপূর্ণ আয়াতসমূহ দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করছি।

আবার ইব্রাহীম (আ.)-এর এ দোয়াও ছিল যে **ইয়ু আল্লিমুহুমুল কিতাব** আর নবী করীম (স.) বলেছেন, 'আতুলু ওয়াল কুরআন'– পরিপূর্ণ ও পূর্ণতা দানকারী এ শরীয়ত (বিধান) ওই দোয়া কবুল হওয়ার কারণেই জগতের সামনে রাখছি।

ইব্রাহীম (আ.)-এর আরও দোয়া ছিল '**....ওয়াল হিকমাতা–** সে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি শিখাবে'। আর নবী করীম (স.) বলেন, 'আত্‌লু ওয়াল কুরআন'-এ কুরআন, যা হলো হেকমতে পরিপুর্ণ ও 'হিকমাতান বালিগা'– পূর্ণতাপ্রাপ্ত হিকমত– দুনিয়ার সামনে তা রাখছি।

এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ওই তিনটি দোয়াই গৃহীত হওয়ার ফলশ্রুতিতে নবী করীম (স.)-এর মুখ থেকে একটি-দু'টি বাক্য নিঃসৃত করিয়ে আল্লাহ্ তা'লা ওই তিনটি বিষয়েরই পূর্ণতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপরন্তু আরবী অভিধানও এ অর্থসমূহ সমর্থন করে।

পঞ্চম বিষয় ছিল **ইয়ুযাকক্বিহীম** সে তাদের পবিত্র করবে। নবী করীম (স.) 'ইয়ুযাকক্বিহীম'এর পাশাপাশি এই বলেন যে,

فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ

ফামানিহ্তাদা ফা ইন্নামা ইয়াহ্তাদী লিনাফসিহী (ইউনুস : ১০৯) অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার ভাব ও বিষয় অপেক্ষা গভীরতর ভাব ও বিষয় তিনি জগত সমক্ষে রেখেছেন। 'ফামানিহ্তাদা' আমি এ ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি **তাযকিয়ায়ি নফস** আত্মশুদ্ধির সব উপকরণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। এজন্য ইয়ুযাক্ক্বিহীম সংশ্লিষ্ট দোয়া পূর্ণতা লাভ করেছে।

তবে আমি তোমাদের বলছি যে, তোমাদের চিত্তের শুদ্ধতা কোন প্রকারের বল প্রয়োগ করে বা জোর খাটিয়ে করা হবে না। আত্মশুদ্ধির সব উপকরণ এখানেই রয়েছে যা আমি তোমাদের সমক্ষে রাখছি।

ফামানিহ্ তাদা ফা ইন্নামা ইয়াহ্তাদী লিনাফসিহী

তোমাদেরকে এখন সাধ্য-সাধনা করে প্রচেষ্টা চালিয়ে, তোমাদের নিজেদের আত্মত্যাগ করে, তোমাদের নিজেদের একনিষ্ঠ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে, খোদার পথে নিজেদের জীবন লুটিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে পবিত্রতা সৃষ্টি করতে হবে। উপকরণ তো আমি নিয়ে এসেছি কিন্তু চিত্তের এ পবিত্রতা জোর করে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না বরং তোমাদের প্রকাশ্য স্বাধীনতা রয়েছে। পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বিদ্যমান তা থেকে উপকার গ্রহণ কর ও এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পাক-পবিত্রতার পূর্ণতায় পৌঁছতে তোমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বাইরের ভিন্ন কোন শক্তি তোমাদের বশীভূত করে তোমাদের চিত্তের শুদ্ধতা এনে দিবে না আর তা করা সম্ভবও নয়। অতএব 'ফামানিহতাদা ফা ইন্নামা ইয়াহ্তাদী লিনাফসীহি' হেদায়াতের উপকরণ এসে গেছে, আত্মশুদ্ধির উপকরণ এসে পড়েছে। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির এ উপকরণ থেকে কল্যাণ লাভ করতে নিজের জন্য হেদায়াতের পথ খুঁজে ও বেছে নেয় সে নিজ আত্মার মঙ্গল সাধন করে।

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

ওয়ামান যোয়াল্লা ফা ইন্নামা ইয়াযিল্লু আলাইহা (ইউনুস : ১০৯)

আর যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির উপকরণসমূহ থেকে উপকার গ্রহণ করে না এবং হেদায়াতের পথের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না বরং হেদায়াতের বদলে ভ্রষ্টতার পথে চলতে থাকে আর নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু প্রতিপালকের পরিবর্তে শয়তানের দিকে মুখ করে ওর অনুসরণ করতে থাকে, এক্ষেত্রে আমি তাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমাকে এ পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখতেও জোর খাটানো হবে না।

إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

ইন্নামা আনা মিনাল্ মুনযিরীন (সূরা নমল : ৯৩)

আমি তো সাবধানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী রসূলদের মধ্যে এক রসূল। এটি সঠিক যে সবার থেকে বড়, সবার থেকে উৎকৃষ্ট, সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ্ তা'লার নিকটতম, তবে আমার মর্যাদা সতর্ককারী ব্যতিরেকে ভিন্ন কিছু নয়। আমি তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করছি না, জোর খাটিয়ে ভ্রষ্টতার পথ থেকে তোমাদের ফিরানো যেমন আমার কাজ নয় তেমনই বল প্রয়োগে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসাটাও আমার কাজ নয়। **ওয়া কুল্লিল হামদুলিল্লাহ্-** এ কথা বলে দাও যে সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি 'ইসলাম'এ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অকাট্য দলীল প্রমাণ পূর্ণ আয়াত ও 'আল কিতাব' ও 'আল হিকমাহ' আর পবিত্র করার উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এমন এক রসূল প্রেরণ করেছেন যিনি পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী নমুনা জগত সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। যার অনুগমন ও অনুসরণের ফলে মানুষ নিজ প্রভু প্রতিপালকের ভালোবাসা পেয়ে যায় আর তাঁর পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। **আলহামদুলিল্লাহ্** সকল প্রশংসার অধিকারী সেই খোদা। **সা ইয়ুরীকুম আয়াতিহী ফাতাঅ'রিফুনাহা** যিনি ইসলামের দ্বিতীয় বিজয়োত্থান কালে পুণর্বার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, অকাট্য দলিল প্রমাণপূর্ণ আয়াত ও কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ ঘটাবেন, এর প্রজ্ঞা ও তত্ত্বদর্শন বর্ণনা করবেন আর এমন উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে দিবেন যে দুনিয়াতে ধর্মের জন্য পথ চলা সহজতর হয়ে উঠবে ও মানুষ প্রফুল্লচিত্তে নিজ প্রভু প্রতিপালকের জন্য আত্মত্যাগ ও কুরবানী করতে থাকবে। আর ধর্মের পূর্ণ প্রচারকালে অর্থাৎ ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্বিজয়ের যুগে একে একে সমগ্র জগতবাসী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কোলে তাঁর (স.) রহমতের ছায়ায় এসে যাবে। আর সে সময়ে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে, যে প্রতিশ্রুতি বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে তিনি দিয়েছিলেন, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ও প্রিয় একই উম্মত– **উম্মতে ওয়াহেদা** পরিণত করে দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার রয়েছে।

এ আয়াতে করীমা–**রাব্বানা ওয়াবআছ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম**-এ পাঁচটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্য ও দোয়া তো এটা ছিল যে, তাদের মাঝে এমন এক রসূল আবির্ভূত হোক, যার এমন সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী হবে যা এখানে বর্ণিত হয়েছে; যিনি হবেন পরিপূর্ণ উত্তম আদর্শ, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কল্যাণ সর্বদা প্রবহমান থাকবে।

দ্বিতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীতে পূর্ণ অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সত্য দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হয়ে অপরিবর্তনীয় ও অনুপম ব্যবস্থাপনা জগত লাভ করবে।

তৃতীয় পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী এমন এক বিধান প্রবর্তিত হোক যাতে কখনও কোন প্রকারের ফাঁক দৃষ্টিগোচরে না আসে, বৈকল্য বা বৈসাদৃশ্যও দেখা না দেয়।

চতুর্থ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ক্রমোন্নতি লাভ করে পূর্ণতার শীর্ষে যখন পৌঁছাবে, সে সময় তাদেরকে হেকমতের কথাগুলো জানাও, অবশ্যই জানাও। দলীল প্রমাণ দিয়ে জানাও যে এসব নির্দেশনা এজন্য দেয়া হচ্ছে। এবং

পঞ্চমত এ সবের কার্যকর পরিণতিতে **তাযকিয়ায়ে নফুস**-এর অর্থাৎ তাদের আত্মশুদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে **আয়াত বায়্যিনাত**– স্পষ্ট নিদর্শনাবলীপূর্ণ অকাট্য দলীল প্রমাণ ছাড়া আর শরীয়ত প্রদত্ত নির্দেশাবলী যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে আর যেসব হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া তাযকিয়ায়ে নফুস-আত্মশুদ্ধি সম্ভবই নয়। আসল উদ্দেশ্য এই-ই ছিল যে ‘উম্মতে মুহাম্মদীয়া’কে সৃষ্টি করা ও প্রতিষ্ঠা দেয়া। এটাই ছিল মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন তা পূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর উত্তম আদর্শ অনুধাবন করে এবং তাঁর অনুগমন ও অনুসরণ করে, যে ব্যক্তি আয়াত বাইয়্যিনাত থেকে উপকার ও কল্যাণ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ শরীয়তের আদেশ ও নিষেধগুলোর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করে আর এসবের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় ও তার উপর আমল করে আর এভাবে সেই ব্যক্তি তাযকিয়ায়ে নফুস–আত্মশুদ্ধি- চিত্তের শুদ্ধতা লাভ করে। ওই ব্যক্তি বা জাতি হচ্ছে সে-ই যার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতের সূচনা হয়েছে **উযিআ’ লিন্নাস** দিয়ে আর এতে **কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিযাতি লিন্নাসও** বলা হয়েছে। বর্ণিত আয়াতের শুরু হয়েছে **ইন্না**

আওওয়ালা বাইতিঁও উযিআ'লিন্নাস দিয়ে আর শেষ বিষয় যা রয়েছে তা 'রাব্বানা ওয়াবআছ ফিহিম রাসুলাম মিনহুম'–এ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **রাব্বানা ওয়াব আছ ফিহিম রাসূলাম মিনহুম**-এ যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা বাদ দিয়ে বাকী উদ্দেশ্য সফল হতেই পারে না, যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে আর যে সবের প্রতি কিছুটা আলোকপাত আমি পূর্বে করে এসেছি। যতদিন পর্যন্ত ওইসব উদ্দেশ্য সফল না হয় ততদিন উম্মতে মুসলেমা **খায়রে উম্মত** কল্যাণকর ও কল্যাণকামী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। কুরআন করীমের **আল্ কিতাব** হওয়ার বিষয় এবং কুরআন করীমে বর্ণিত হেকমত প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দু'টি উদ্ধৃতি আমি এখন বন্ধুদের শুনাতে চাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

> আজ এ বিশ্বজগতে সকল ঐশী কিতাবসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র **ফুরকানে মাজীদ** (সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী পবিত্র কুরআন) -ই হল কালামে ইলাহী অর্থাৎ যার ঐশী বাক্য হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত...
>
> এতে রয়েছে সত্যতা প্রতিপন্নকারী বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী দলীল ও প্রত্যুৎপন্ন ক্ষুরধার যুক্তি যা এর সত্যতা সাব্যস্ত করে। এতে বর্ণিত নির্দেশমালা সম্পূর্ণভাবে সত্যের উপর প্রমাণপুষ্ট হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। ...এতে এ সৌন্দর্য রয়েছে যে... এটি কোন ধর্ম-বিশ্বাস জবরদস্তি করে কারো উপর চাপিয়ে দিতে চায় না বরং যে শিক্ষাই দেয় প্রথমে তার সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায়, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও স্বার্থ চিহ্নিত করে, অকাট্য দলিল ও প্রমাণ দ্বারা সত্যতাকে সাব্যস্ত করে এবং নীতিগত প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রামাণিক দলীলসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে **ইয়াকীনে কামেল ও মারেফাতে তাম**– দৃঢ় ও পরিপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ-জ্ঞান ও ধর্ম-দর্শনের নিগূঢ় রহস্যকে উন্মোচিত করে সম্মানিত মর্যাদায় উন্নীত করে দেখায়। আর যে সমস্ত দূষণ ও অপবিত্রতা, বিপর্যয় ও বৈপরীত্য জনগণের আকীদা ও আমলে অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস ও কর্মে, কথায় ও কাজে পরিলক্ষিত হয়, এ যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতাকে প্রখর ও সূক্ষ্ম যুক্তির উজ্জ্বল ও আলোকময় দ্যুতি দ্বারা বিদূরীত করে। যাবতীয় শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষা লাভ করা 'প্রাণী মানুষ'কে 'মানবে' পরিণত করতে

নেহায়েতই জরুরী আর প্রতিটি বিশৃংখলাপূর্ণ ভ্রষ্টতাকে প্রবল ও সার্থক ভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে দেয়, যা আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র সে শিক্ষাই যথাযথ মজবুত ও সুদৃঢ়, প্রভাব বিস্তারী ও পরাক্রমশালী [বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় খন্ড (মোকদ্দমা), রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯১-৯২]।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'মা'রেফে দাকীকা অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান সেটিই, যাকে **ফুরকান মজীদ**-এ **হিকমত** নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

ইয়ুতিল্ হিক্মাতা মাইইয়াশাউ ওয়া মাইয়ুতাল হিকমাতা ফাক্বাদ উতিয়া খায়রান কাছীর (আল বাকারা : ২৭০)।

অর্থাৎ খোদা যাকে চান হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয়েছে তাকে **খায়রে কাছীর** প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হেকমত বা প্রজ্ঞা খায়রে কাছীরের বা অধিকতর ভাল-এর স্থলাভিসিক্ত অর্থাৎ 'শ্রেয়তর'-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে কেউ হেকমত লাভ করেছে সে খায়রে কাছীরও পেয়ে গেছে। অতএব এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় রহস্য যা অন্য কথায় 'হেকমত' নামে আখ্যায়িত। এটি খায়রে কাছীরের স্থলাভিসিক্ত হওয়ার কারণে শ্রেয়তর যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল পরিবেষ্টনকারী মহাসমুদ্র সদৃশ (বাহরে মুহীত) এক বিশালত্ব নিয়ে বিদ্যমান যা ঐশী নির্দেশনা পালনকারীদের– 'কালামে ইলাহী'র অনুসারীদের দেয়া হয়ে থাকে এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টায় এমন এক বরকত নিহিত থাকে যা উঁচু মার্গের। চিরন্তন সত্য, সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান (**হাকায়েকে হাক্কা**) তাদের স্বচ্ছ হৃদয়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে আর এভাবে পরিপূর্ণ সত্যতা তাদের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড, পাদটীকা ৩, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা ৫৩৩)।

নবরূপে সংস্কার করে বায়তুল্লাহ্ পুণর্নির্মাণের তেইশটি উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা শেষ হল। এটি বর্ণনা করা এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে আল্লাহ্ তাআলা একদিন প্রবলভাবে আমার দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করলেন যে– বর্তমান

প্রজন্ম, যাকে আহমদীয়াতের তৃতীয় প্রজন্ম বলা যেতে পারে, এদের সুষ্ঠু ও সঠিক তরবিয়ত (প্রশিক্ষিত) করা অত্যন্ত জরুরী। আহমদী, যাদের বয়স ২৫ (পঁচিশ) বছরের মধ্যেই রয়েছে অথবা যাদের আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্তির পর ১৫ (পনর বছর) অতিক্রান্ত হয় নি, ঐ অংশকে যদি সুষ্ঠু ও সঠিক তরবিয়ত না করা হয় তবে ওই মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে বড় বড় বাধা সৃষ্টি হবে, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে **'জারী ইয়ুল্লাহি ফী হুলালিল আম্বীয়া'**রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং সেই একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করালেন যে, কোন্ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যার বিবরণ বর্ণিত এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে আর সেগুলোর উপর আমি ধারাবাহিক খুতবা প্রদান করে চলছি। এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী যদি সঠিকভাবে বুঝানো ও হৃদয়ঙ্গম করানো যায় আর তা অর্জন করতে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও অনুকম্পায় আমাদের এ চারাগাছগুলো সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে তরবিয়ত পেয়ে মহান ওই দায়িত্বাবলী পালনে সক্ষম হয়ে উঠবে, যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অদূর ভবিষ্যতে তাদের কাঁধে ন্যস্ত হতে যাচ্ছে। আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, কেননা আগামী ২০ (কুড়ি), ২৫ (পঁচিশ) বছর ইসলামের পুনর্বিজয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংগ্রামমুখর কাল। ইসলামের বিজয়ে বড় বড় বিশাল উপকরণ সৃষ্টি করা হবে এবং দুনিয়া দ্রুততার সাথে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করবে। সেই সময়ে একই ধারায় তাদের জন্য মুরব্বী ও মোয়াল্লেমের চাহিদা দেখা দেবে, এত অধিক সংখ্যায় মোয়াল্লেম মুরব্বী জামা'ত তখন কোথা থেকে যোগাবে যদি আজ সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা না হয়। এজন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সে বিষয়টি ভাবো যার উল্লেখ এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ওই উদ্দেশ্যসমূহ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কালামের আলোকে যে উত্তম মানের তরবিয়তের প্রয়োজন ঐ মানের তরবিয়ত নিজেদের যুবকদের দাও। কারণ সময় যখন আসবে ওদের মধ্যে যেন অধিক সংখ্যায় মুরব্বী ও মোয়াল্লেম হিসেবে দ্রুততার সাথে জীবন উৎসর্গকারী মজুদ থাকে, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে এক মহান ধর্মে একত্রিত করে দেয়া যায়। ধারাবাহিকভাবে খুতবাগুলো প্রদানকালে আল্লাহ্ভক্ত সম্মানিত এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন যে, আপনার যে খুতবাগুলো প্রদান করা হচ্ছে সেগুলোর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক ইলহামের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা তাযকেরার ৪র্থ সংস্করণ এর ১০৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে:

এর কথাগুলো হল– **যে ব্যক্তি কাবার ভিতকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-দর্শনের এক পাদপীঠ বলে জানে, সে-ই বড় বুদ্ধিমান, কেননা, ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের অংশ সে লাভ করেছে।**

অতএব, আমি মনে করি মহান আল্লাহ্ তা'লা যিনি আমার দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করছেন, খোদা চান- আধ্যাত্মিক যে তত্ত্ব-দর্শনের সাথে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত নির্মাণের সম্পৃক্ততা রয়েছে, জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও যুবকেরা পুরুষেরা ও নারীরাও ঐশী প্রজ্ঞাপূর্ণ সে বিষয় বুঝে উঠুক, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছে **উলুল আলবাব** অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। তারা যেন তাঁর আহ্বান, তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলী ও উক্ত নির্দেশাবলীর গূঢ় রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়ে যায় এবং ঐ পবিত্র অনুসারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার সর্বপ্রকার করুণা ও কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে।

যে কর্মসূচী বা পরিকল্পনা আমি এখন জামাতের উদ্দেশ্যে রাখব তার প্রকৃত মর্ম ঐসব যুবকদের তরবিয়ত করা, যাদের বয়স– তারা আহমদীয়াতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকলে ২৫ বছরের মধ্যে হবে, আর যদি তারা আহমদীয়াতে নব যোগদানকারী হয়ে থাকে তবে আহমদীয়াতে তাদের অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা হবে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে। আমাদের তরবিয়ত করতে হবে মূলতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও যুবকদের। তবে তাদের বড়দের তরবিয়তও জরুরী যাতে তারা এ নব প্রজন্মের তরবিয়ত করতে পারে। অতএব, আমার পরবর্তী সম্বোধিতরা হলো জামাতের ওই সব পুরুষ ও জামাতের ওই সব বোনেরা যাদের বয়স এখন ২৫ (পঁচিশ) বছরের উর্ধ্বে। কেননা এই লক্ষ লক্ষ যুবক যাদের বয়স ২৫ বছরের কম বা অন্যভাবে বললে ১৫ বছরের কম বয়সের তাদের তরবিয়ত কেবলমাত্র আমি একা বা আমার কতিপয় সাথীর দ্বারা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি গৃহের সহযোগিতা করতে হবে যাতে প্রতিটি গৃহের লালিত-পালিতরা খোদা তা'লার সৈনিকে পরিণত হয় আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়। আমাদেরকে প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি ওয়ার্ড, প্রতিটি নগর ও জনপদে পবিত্রতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঐ সমাজে সেই প্রজন্মের জন্ম হয় যারা হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুনাম, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন ও সময়, সম্মান ও সম্পদ ব্যয় করে সর্বতোভাবে জীবন উৎসর্গকারী হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন প্রথমে বড়দের তরবিয়ত করা আবশ্যক যাতে পরবর্তীতে তাদের দ্বারা ছোটদের তরবিয়ত করা যায়, যাদের

উপর অদূর ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় দায়িত্ব এসে পড়বে। স্মরণ রেখো! আমরা যদি এতে অবহেলা দেখাই আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নিপতিত হবে। অন্য এক জাতি সৃষ্টি করা হবে যারা খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি পূরণের ভাগীদার হবে। অতএব, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন কর আর ওইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পূরা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও যা ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী এক পরিকল্পনার অধীনে তোমাদের উপর অর্পণ করতে যাচ্ছি। আর এ প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তাঁরই দেয়া সামর্থ্য অনুযায়ী পরবর্তী খুতবাগুলোতে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করব।